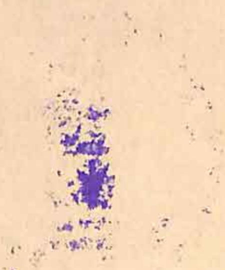
# বিজ্ঞানিকা

প্রথম ভাগ





পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে
ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত।
[ Vide Notification No. Syl./79/54, dated, 27. 12. 54. ]

# বিজ্ঞানিকা



প্রথম ভাগ



[ ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ]

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ**, এম্. এস্-সি.
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ মেমোরিঅ্যাল পুরস্কার প্রাপ্ত )
অধ্যাপক, হুগলী মহসীন কলেজ



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯



সংশোধিত সংস্করণ
এগার আনা

চিত্রশিল্পী ঃ
শ্রীমনুজ গুহ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

# সূচীপত্র

ADAMS
DICKEY

C954

# BASIC PRINCIPLES OF STUDENT TEACHING

# বিজ্ঞানিকা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### কয়েকটি আবিষ্কারের গল্প

এক দেশের রাজা একটা সোনার মুকুট তৈরি করালেন। মুকুটটা খুব সুন্দর হল, তাতে কত সূক্ষ্ম কাজ! সবাই প্রশংসা করতে লাগল, কিন্তু রাজার সন্দেহ হল স্যাকরা হয়তো সোনা চুরি করে তার বদলে খাদ মিশিয়ে দিয়েছে। রাজা যতটা সোনা দিয়েছিলেন মুকুটের ওজনও ঠিক তাই। এখন কি করে বোঝা যায় ওতে সস্তা ধাতুর খাদ আছে কিনা? এর মীমাংসা করে দেবার ভার পড়ল বিজ্ঞানীর ওপর।

বিজ্ঞানী ভাবছেন আর নানারকম পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি একই আয়তনের দু'খানা চাক্‌তি গড়ালেন, একটা সোনার আর একটা রূপার। দেখলেন সোনার চাক্‌তিটা রূপার চাক্‌তির প্রায় দু'গুণ ভারি। বিজ্ঞানী ভাবলেন, মুকুটটা গালিয়ে একটা চাক্‌তি বানালে তার আয়তন জানা যাবে। তখন সেই আয়তনের একটা সোনার চাক্‌তি ওজন করলেই বোঝা যাবে মুকুটটা খাঁটি সোনার কিনা। কিন্তু মুকুটটা গালিয়ে ফেললে তো এত পরিশ্রম সবই বৃথা যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে মুকুটটা না গালিয়েও তার আয়তন বের করা যায়।

বিজ্ঞানী ক্রমাগত ভাবছেন, কয়েক দিন চলে গেল তবু এর মীমাংসা হল না। একদিন চৌবাচ্চায় জল কানায় কানায় ভরা, বিজ্ঞানী তাঁর সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে স্নান করতে নেমেছেন।

দেখলেন, খানিকটা জল উপচে পড়ল। একটা ডুব দিয়ে উঠে এলেন। এবারে দেখলেন, চৌবাচ্চার জল বেশ খানিকটা নেমে গেছে। তাঁর মনে হল, তাঁর দেহের আয়তনের সমান জল নিশ্চয়ই উপচে পড়েছে। এতদিনে তাঁর সমস্যার সমাধান হল বুঝতে পেরে তিনি আনন্দে চীৎকার করতে লাগলেন, 'আমি পেয়েছি', 'আমি পেয়েছি'।

এবারে মুকুটটার আয়তন বের করার একটা উপায় হল। তিনি একটা পাত্র কানায় কানায় জলে ভর্তি করে তাতে মুকুটটা ডুবিয়ে দিলেন এবং যতটা জল উপচে পড়ল তাই মাপলেন। তারপর ঠিক সেই আয়তনের একটা সোনার চাক্‌তি তৈরি করে ওজন করলেন। দেখলেন, সোনার চাক্‌তির চেয়ে মুকুটটা অনেক হালকা। এইভাবে ধরা পড়ে স্যাকরা তার দোষ স্বীকার করল। চারদিকে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জয়গান আরম্ভ হল।

* * * *

আগে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী সমতল আর তার চারদিকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এইসব ঘুরছে। কোপারনিকাস সব-প্রথম বুঝতে পারলেন, পৃথিবী গোলাকার এবং সে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর লাট্টুর মত ঘুরছে। আরও গবেষণা করে তিনি বুঝলেন, প্রকৃত-পক্ষে সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে। কিন্তু তাঁর এইসব আবিষ্কার তখনকার অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের এতই বিরোধী ছিল যে, দীর্ঘ তের বছর ধরে তিনি কাউকে একথা বলতে সাহস পাননি।

* * * *

গ্যালিলিও উপাসনা-মন্দিরে গেছেন। সেখানে লম্বা দড়ি থেকে একটা বাতি ঝুলে আছে। বিজ্ঞানী অবাক্ হয়ে দেখছেন, বাতিটা

ক্রমাগত একই তালে তুলছে, তার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এই দেখে তাঁর মনে যে প্রশ্ন জাগল তারই সমাধানের জন্য তিনি নানারূপ গবেষণা সুরু করলেন এবং কিছুদিন পরে দোলক-ঘড়ির মূল সূত্রগুলো আবিষ্কার করলেন।

ক্রমে গ্যালিলিও দূরবীণ তৈরি করলেন এবং আরও কত বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করলেন। দেশ-বিদেশে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃত হলেন। দূরবীণের সাহায্যে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানা আরও সহজ হল। কোপারনিকাসের মত তিনিও বললেন যে, সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। কিন্তু এইরকম ধর্ম-বিরোধী শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর বিচার হল। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি তাঁর এই মতবাদ অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। আগেকার মানুষ কত অজ্ঞ ছিল, আর তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করা ছিল কত কঠিন, তাই একবার ভেবে দেখ! কিন্তু মানুষ এইসব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে তার সাধনার পথে এগিয়ে এসেছে।



গ্যালিলিও

* * * * *

বিজ্ঞানী বাগানে গাছতলায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়ল। তার মনে প্রশ্ন হল, তাইতো, আপেলটা মাটিতে পড়ল কেন? ফল পাকলে তো চিরকালই মাটিতে পড়ে,

এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে! বিজ্ঞানী নিউটনের মনে এই প্রশ্ন

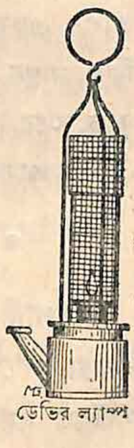

নিউটন

জেগেছিল বলে আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, পৃথিবী সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেল মাটিতে পড়ে। এই পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়েই চাঁদ তার চারদিকে ঘুরছে। আবার সূর্যের বিপুল আকর্ষণ আছে বলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চারদিকে ঘুরছে। এইভাবে একটা সামান্য ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হল।

* * * * *

কয়লাখনিতে মাঝে মাঝে একরকম গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসে হঠাৎ আগুন লাগলে গুরুতর দুর্ঘটনা হয়, তাতে শত শত লোক মারা যায়। কত হতভাগ্য খনি-শ্রমিক যে এইভাবে প্রাণ হারাল তার হিসেব রইল না। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এইরকম অগ্নিকাণ্ড বন্ধ করার সংকল্প নিয়ে বিলেতে একটা কমিটি বসল। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ


হাম্ফ্রি ডেভি


ডেভির ল্যাম্প

বিজ্ঞানী হাম্ফ্রি ডেভির উপর এর মীমাংসা করার ভার পড়ল। অনেক দিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি একটা 'ল্যাম্প' আবিষ্কার করলেন। এতে চিমনির বদলে তামার একটা জাল দিলেন। এই বাতি নিয়ে নির্ভয়ে কয়লাখনিতে চলা-ফেরা করা সম্ভব হল, গ্যাসে আগুন লাগবার কোন ভয় রইল না। এইভাবে শত শত খনি-শ্রমিকের জীবন রক্ষা হল। বিজ্ঞানীর নূতন নামকরণ হল—'খনি-শ্রমিকের বন্ধু'।

* * * *

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কি খেয়াল হল, রেশমের সুতোয় ঘুড়ি বেঁধে ওড়ালেন। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। দেখলেন,



বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

যেই বিদ্যুৎ চমকায় অমনি তাঁর হাতে ঝাঁকুনি লাগে। তিনিই প্রথম

এইভাবে আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎ নামিয়ে আনলেন। বিজ্ঞানের নূতন যুগ আরম্ভ হল।

* * * * *

মাইকেল ফ্যারাডের একটা অতি সহজ পরীক্ষা থেকেই বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। তিনি দেখেন, একটা চুম্বকের কাছে একটা তার রেখে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালাতে থাকলে চুম্বকটা ঘুরে যায়। আবার একটা শক্তিশালী চুম্বকের মধ্যে বিদ্যুৎবাহী তার থাকলে সেটা বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে। এই পরীক্ষায় যখন চুম্বক ও বৈদ্যুতিক তার সত্যি সত্যি ঘুরতে আরম্ভ করল, তখন ফ্যারাডে আনন্দে অধীর হয়ে ছোট্ট ছেলের মত নাচতে লাগলেন আর চীৎকার করতে লাগলেন, 'ঐ যে ওরা ঘুরছে', 'ঐ যে ওরা ঘুরছে'।



ফ্যারাডে

এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান উন্নতির পথে আরও অনেক এগিয়ে গেল। বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামো আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে আজ আমরা বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, সিনেমা, রেডিও, আরও কতরকম যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি।

## জলে, স্থলে ও আকাশে মানুষের জয়যাত্রা

সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ নদীর জলে ভেলা ভাসাত। কিন্তু ভেলায় চড়ে ইচ্ছামত যাওয়া যায় না, তাই কাঠ খোদাই করে ডোঙা

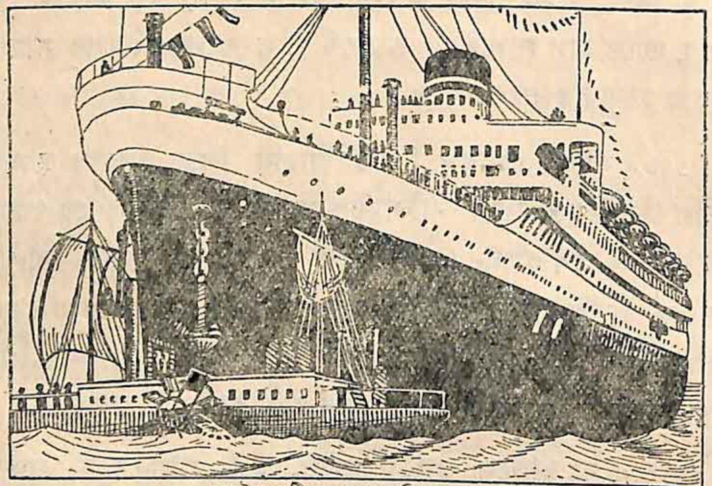
বানাল, তারপর কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়ে নৌকো তৈরি করল। এতে ছোট-বড় নদী পার হতে তার খুবই সুবিধে হল। নদী পার হতে পেরে মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা হল সে দিগন্ত-বিস্তৃত নীল সাগরে পাড়ি দেবে। এই উদ্দেশ্যে সে কাঠ দিয়ে বড় বড় জাহাজ তৈরি করল, তাতে হাল লাগাল। বড় বড় পাল তুলে বাতাসের সাহায্যে জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করল।

১৪৯২ সালে এইরকম তিনটি জাহাজ নিয়ে কলম্বাস ক্রমাগত ছত্রিশ দিন দিগন্তপ্রসারী আটলান্টিক মহাসাগরে ভেসে গিয়ে তারপর আমেরিকায় পৌঁছালেন। এর পাঁচ বছর পরে ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে শেষে ভারতবর্ষে পৌঁছালেন। অজানা নীল সাগরে পাড়ি দেবার ভয় ভেঙে গেল। মানুষ ক্রমে কত নূতন দেশ, কত নূতন দ্বীপ আবিষ্কার করল!

বাতাস না থাকলে জাহাজ অচল, তাই পাল-তোলা জাহাজে আবার দাঁড় লাগাল। শত শত দাস নিয়োগ করে এইসব জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা হল। এসব হতভাগ্য দাস জন্তু-জানোয়ারের মত শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত জাহাজের সঙ্গে, যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। দৈবাৎ জাহাজ ডুবে গেলে এরাও সেইসঙ্গে ডুবে মরত।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর অনেকে বাষ্পের সাহায্যে নৌকো চালাবার কথা ভাবতে লাগলেন। বিজ্ঞানী ফুলটন ১৮০৭ সালে প্রথম যে বাষ্পীয় পোত তৈরি করেন, তা বত্রিশ ঘণ্টায় দেড় শ মাইল দূরে যেতে পারল। এর ফলে নদীপথে যাতায়াতের অনেক সুবিধা হল। মানুষ ক্রমে স্টীমার, জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ বানাল।

তাতে কামান বসাল, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল। আজকের বড় একটা জাহাজ যেন ছোটখাটো একটা শহরের মত, তাতে সব কিছু আছে। এতে একসঙ্গে প্রায় তিন হাজার লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। এই



ফুলটনের ষ্টীমার ও আধুনিক জাহাজ

রকম একটা জাহাজে লণ্ডন থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছাতে লাগে মাত্র সাড়ে চার দিন!

* *   * *   * *

সভ্যতার সুরু থেকেই মানুষ চাকার গাড়ী বানাতে শেখে এবং গরু, ঘোড়া ইত্যাদি জীবজন্তু বশ মানিয়ে তাদের দিয়ে গাড়ী টানায়। বহুদূরের পথ যেতে হলেও তখন এইরকম গাড়ী ছাড়া উপায় ছিল না। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর মানুষের দূরপথে যাতায়াতের অসুবিধা অনেক কমে গেল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের গল্প বলছি, শোন।

একটা কেটলিতে জল ফুটছে, ঢাকনাটা কি রকম উপর-নীচ হচ্ছে। বালক জেম্‌স্ ওয়াট তাই অবাক্ হয়ে দেখছেন। ভাবছেন, কেটলির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা শক্তি জন্মাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, বাষ্পের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চয়ই অনেক কিছু করা যাবে। এই বালকই বড় হয়ে ১৭৬৫ সালে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করলেন, তার সাহায্যে খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ অনেক সহজ হল।


জেম্‌স্ ওয়াট

গরীব খনি-শ্রমিকের ছেলে জর্জ স্টিফেনসন, লেখাপড়াও শিখতে পারেন নি। তিনি সামান্য বেতনে চাকরি করে খেতেন। একটা কয়লাখনিতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাবার কাজ পেলেন। এখানে ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের বিষয় অনেক শিখলেন। কিন্তু আঠারো বছর বয়সেও লেখাপড়া জানেন না বলে খুবই অসুবিধা, তাই একটা নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। উনিশ বছর বয়সে যখন প্রথম নাম সই করতে পারলেন, তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে!

তারপর থেকে তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন; কর্তৃপক্ষের সাহায্যও তিনি যথেষ্ট পেলেন। তিনি ভাবলেন, বাষ্পের সাহায্যে গাড়ী চালাবেন। এই উদ্দেশ্যে নানা-রকম গবেষণা করে শেষে প্রথম রেল-ইঞ্জিন ও গাড়ী আবিষ্কার

করলেন। লম্বা রেল-লাইন পাতা হল, স্থির হল ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এর প্রথম পরীক্ষা হবে। আহার-নিদ্রা ভুলে লোকে এই পরীক্ষা দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ইঞ্জিন চালাবার জন্য স্টিফেনসন প্রস্তুত হলেন। দর্শকরা চীৎকার করে, রুমাল উড়িয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগল। বিজ্ঞানী ইঞ্জিনের চাবি খুললেন, ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল, সমস্ত গাড়ীটা দু'একবার ঝাঁকানি খেল, তারপর সামনের দিকে ছুটে চলল। আনন্দে অধীর জনতার চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।



জর্জ স্টিফেনসন



রকেট ইঞ্জিন ও আধুনিক ইঞ্জিন

এর চার বছর পরে স্টিফেনসন তাঁর বিখ্যাত রকেট ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং লিভারপুল ও ম্যানচেস্টারের মধ্যে ঘণ্টায় প্রায়

ত্রিশ মাইল বেগে এই গাড়ী চালিয়ে সবাইকে অবাক্ করে দেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রেল-ইঞ্জিনের আরও কত উন্নতি হয়েছে! এখন একটা বিরাট ইঞ্জিন যে কত লম্বা ও ভারি মালগাড়ী অনায়াসে টেনে নিয়ে চলে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। আজকের একটা দ্রুতগামী গাড়ী শত শত যাত্রী নিয়ে অনায়াসে ঘণ্টায় ৭০-৮০ মাইল বেগে ছুটে চলতে পারে।

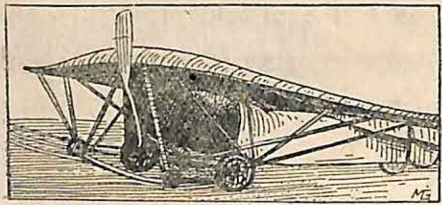
* *  * *  * *

আকাশে ডানা মেলে পাখী কেমন সুন্দর উড়তে পারে। মানুষের সখ হল সেও পাখীর মত উড়বে। হাইড্রোজেন-ভরা বেলুনে করে মানুষ আকাশে উড়েছে; কিন্তু বেলুন বাতাসের সঙ্গে ভেসে যায়, তাতে ইচ্ছামত কোথাও যাওয়া চলে না। কিন্তু মানুষ এমন কিছু বানাতে চাইলে যাতে করে সে ইচ্ছামত আকাশে চলাফেরা করতে পারবে।

বিজ্ঞানী একটা ডানাওয়ালা যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড় থেকে নীচের সমতল ভূমি পর্যন্ত উড়ে আসতে পারলেন। এই-ই মানুষের প্রথম আকাশে ওড়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আর একবার উড়তে গিয়ে যন্ত্রশুদ্ধু মাটিতে পড়ে বিজ্ঞানী প্রাণ হারালেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, বায়ু ভেদ করে উড়তে হলে ডানাওয়ালা খুব হালকা একটা যান তৈরি করতে হবে, আর তাতে খুব হালকা একটা যন্ত্র থাকবে। তবুও জিনিসটা হবে বাতাসের চেয়ে অনেক ভারি, কাজেই আকাশে ভেসে থাকতে হলে এর সামনে একটা পাখা সজোরে ঘোরাতে হবে। অরভিল রাইট ও তাঁর ভাই নানারকম পরীক্ষার পর এই ধরণের একটা যন্ত্র তৈরি করলেন। এর

সামনে একটা পাখা বসান হল এবং পেট্রোলের সাহায্যে সেই পাখা চালাবার ব্যবস্থা করা হল। তাঁদের যন্ত্রটি নকল মানুষ নিয়ে আকাশে উড়ল। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর অরভিল রাইট এই যন্ত্রে চেপে আকাশে উড়লেন এবং নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে এলেন। এই হল এরোপ্লেন আবিষ্কারের গোড়ার কথা।


প্রথম এরোপ্লেন

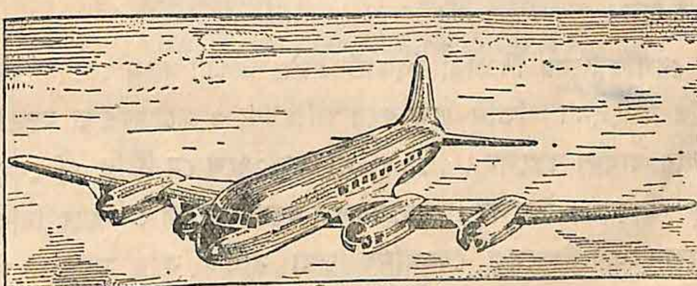
তাঁরা আরও ভাল একটা যন্ত্র বানালেন এবং এর পরের বছর তাতে করে একজন যাত্রী নিয়ে একটানা দেড় ঘণ্টা সময় আকাশে উড়লেন এবং সাড়ে ছিয়াত্তর মাইল পথ অতিক্রম করলেন। চারদিকে এরোপ্লেনের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল এবং ১৯০৯ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথম ইংলিস চ্যানেল পার হতে পেরে অনেক টাকা পুরস্কার পেলেন।

এবারে মানুষের ইচ্ছা হল, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে। ১৯২৭ সালের ২০শে মে লিণ্ডবার্গ নামে এক যুবক এরোপ্লেনে চেপে নিউইয়র্ক শহর থেকে রওনা হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ৩,৬০০ মাইল বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে পৌঁছাবেন।

সকাল সাতটা বাহান্ন মিনিটে লিণ্ডবার্গ আকাশে উড়লেন, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ও ম্যাপের সাহায্যে এগিয়ে চললেন। মাঝে মাঝে দূরে দু'একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে, তা ছাড়া সব নিঝুম, কোথাও যেন জীবনের সাড়া নেই। ক্রমে রাত হয়ে এল, চারদিক্ ঘন কুয়াশায়

আঁধার হয়ে গেল। শুধু যন্ত্রের উপর নির্ভর করে তিনি অন্ধকার অজানা পথে এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে আবার কুয়াশা কেটে গেল, চাঁদের আলোয় তাঁর যাত্রা আবার সহজ হল। এইভাবে রাতের পর আবার দিন এল, তবু চলার বিরাম নেই। ক্রমে দু'একটা জেলে-ডিঙি দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইউরোপের কাছে এসে পড়েছেন। একটু পরেই আয়ার্ল্যাণ্ড দেখতে পেলেন। যন্ত্রসাহায্যে পথের ঠিকানা বের করে তিনি আরও এগিয়ে চললেন, তাঁকে প্যারিস পৌঁছাতে হবে।

প্যারিসের কাছে এরোপ্লেন নামবার মাঠে অসংখ্য লোকের ভিড়। তারা অধীর আগ্রহে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাদের মনে সংশয়, লিণ্ডবার্গ কি সত্যি পৌঁছাতে পারবেন! রাত্রি হয়ে গেল, চারদিকে উজ্জ্বল আলো ফেলা হল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একটা



আধুনিক এরোপ্লেন

এরোপ্লেন আকাশে দেখা গেল। কয়েক মিনিট পরে এরোপ্লেনটি শব্দ করে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে কয়েকবার পাক খেল, তারপর নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে এল। জীবন তুচ্ছ করে লিণ্ডবার্গ অসাধ্য সাধন করলেন। বিপুল জনতা আনন্দে চীৎকার করে তাঁকে

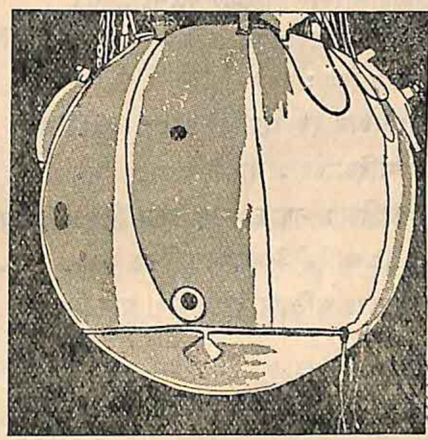
অভ্যর্থনা জানাল। লক্ষ লক্ষ লোক অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখল, বহু পুরস্কার ও পদক দিয়ে বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করা হল।

ক্রমে এরোপ্লেনের আরও কত উন্নতি হয়েছে। এরোপ্লেনে চেপে এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর যে কোন দেশে যাওয়া যায়। এখন সবচেয়ে দ্রুতগামী এরোপ্লেন কত জোরে চলতে পারে, শুনবে? ঘণ্টায় প্রায় আট শ মাইল, অর্থাৎ আজকের এরোপ্লেন শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী ( শব্দের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৭৬৪ মাইল )।

বায়ুমণ্ডলের অনেক খবর আমাদের জানা দরকার। মানুষ তাই বায়ুমণ্ডলেও যতদূর সম্ভব উপরে উঠতে চেষ্টা আরম্ভ করল। বেলুনে চড়ে অনেক দূর ওঠা গেল, কিন্তু দেখা গেল উপরের বায়ু এত হালকা হয়ে গেছে যে সেখানে শ্বাস নেয়া যায় না। মানুষ বুঝল, বেশি উপরে উঠতে চাইলে শ্বাসক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন সঙ্গে নিতে হবে।

বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী পিকার্ড এজন্য একটা নূতন ধরণের বেলুন তৈরি করলেন। তিনি এতে করে অক্সিজেন ও অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নেবার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে মে তিনি এই বেলুনে চড়ে আকাশে উঠলেন। আকাশের কয়েক মাইল উঁচু স্তরে নির্বিঘ্নে উঠলেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে মাটিতে নেমে এলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বেলুনটা আল্পস্ পর্বতের বরফাচ্ছন্ন চূড়ায় এমন জায়গায় পড়ল যে, পিকার্ড ও তাঁর সহকর্মী কোন প্রকারে এক পর্বতারোহীর তাঁবুতে আশ্রয় পেলেন। বেলুনটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হল না বটে, কিন্তু পিকার্ড অনেক কষ্টে তাঁর মূল্যবান যন্ত্রপাতি সব উদ্ধার করলেন। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে তিনি আর একটা

বেলুনে করে আবার বায়ুমণ্ডলে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বেলুনটা হিমালয়ের উচ্চতাও ছাড়িয়ে গেল। এবারে তিনি প্রায় দশ মাইল উঁচুতে উঠে অনেক নূতন খবর জেনে আবার নির্বিঘ্নে নেমে এলেন। ১৯৩৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর অ্যাণ্ডারসন ও স্টিভেন্স





পিকার্ডের বেলুন

সাড়ে তের মাইল অবধি উঠতে পেরেছেন। আজ পর্যন্ত মানুষের এই-ই সবচেয়ে উঁচুতে ওঠা।

এঁদের পরীক্ষায় বোঝা গেল, উপরের বায়ু স্থির এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সেখানে আকাশ ঘোর কালো। সেখানে সূর্যের উত্তাপ ও আলো অত্যন্ত প্রখরভাবে পাওয়া যায়। এই আলো সোজাসুজি চোখে পড়লে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

মানুষের কি দুঃসাহস! বার বার জীবন তুচ্ছ করে সে কত অভিযান চালিয়েছে, আর তাইতে কত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত

হয়েছে। যুগ যুগ ধরে সে যে জ্ঞান আহরণ করেছে তার সাহায্যেই আমরা সভ্যতার পথে এতটা এগিয়ে এসেছি।

## প্রশ্নমালা

১। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের গল্পটি সংক্ষেপে বল।

৩। সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলির পরিক্রমণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় যাহা জান লিখ:

(ক) কোপারনিকাস, (খ) গ্যালিলিও এবং (গ) নিউটন।

৪। রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কারের কাহিনীটি সংক্ষেপে বল।

৫। এরোপ্লেন আবিষ্কার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। এরোপ্লেনে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৬। বায়ুমণ্ডলে মানুষের অভিযান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

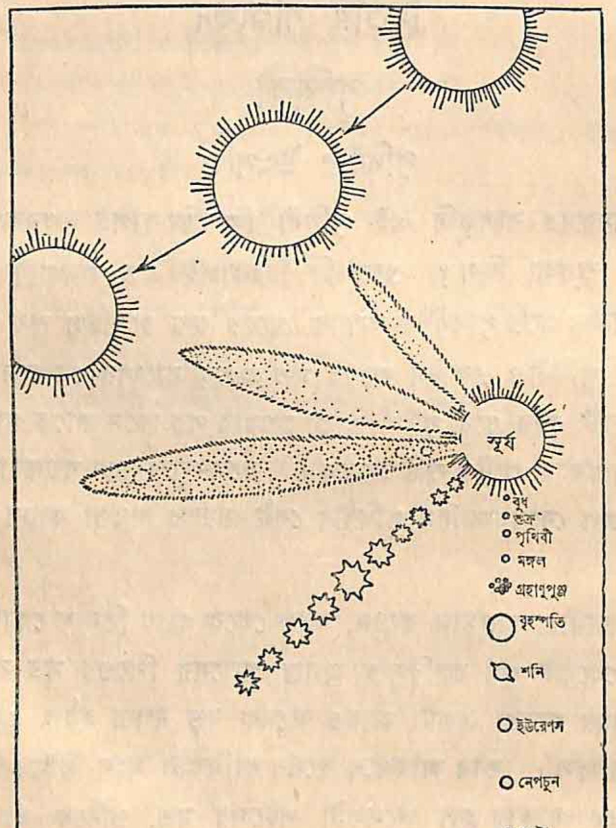
# পৃথিবী

## পৃথিবীর উৎপত্তি

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী কি চিরকালই এখনকার মত সুজলা, সুফলা ছিল? এতে কি চিরকালই এত জনপ্রাণী ছিল? বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের জন্ম হয়েছিল সূর্য থেকে। কাজেই পৃথিবীও একদিন সূর্যের মত জ্বলন্ত বাষ্পের গোলক ছিল। বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার পর ক্রমে তাতে গাছপালা ও নানাপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে-ফুলে-ভরা বসুন্ধরার শান্ত সুন্দর রূপ দেখে আদিম পৃথিবীর সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন!

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আজ থেকে প্রায় তিন শ কোটি বছর আগে থেকেই সূর্য বহুবিস্তৃত জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডের মত রয়েছে। সেই সময় হয়তো একটা আরও অনেক বড় নক্ষত্র হঠাৎ এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তার আকর্ষণে সূর্যের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এল; এর আকার হল অনেকটা পটলের মত, দুদিকে সরু আর মাঝখানটা মোটা। ইতিমধ্যে নক্ষত্রটি অনেক দূরে সরে গেল, কাজেই পটলাকৃতি গ্যাসপিণ্ডটি সূর্যের আকর্ষণে আটকা থেকে তারই চারদিকে ঘুরতে লাগল। ক্রমশ তা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধল এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। এই টুকরোগুলো থেকে এক-একটি

গ্রহের সৃষ্টি হল। মাঝের গ্রহ বৃহস্পতি হল সেইজন্য সবচেয়ে বড় আর তার দু'দিকে গ্রহগুলোর আকার হল ক্রমশ ছোট। এরপর




পৃথিবীর উৎপত্তি

সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর গা থেকে আবার কিছুটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগল—ইহাই চন্দ্র।

জ্বলন্ত বাষ্পগোলক পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে একটি তরল পদার্থের গোলকে পরিণত হল। তখন উহার উপাদানগুলোর মধ্যে যেগুলো বেশি ভারি, যেমন লোহা, নিকেল ইত্যাদি, সেগুলো কেন্দ্রে গিয়ে জমা হল আর হালকা পদার্থগুলো ওপরে ভেসে উঠল। পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়ার বিরাম নেই। শেষে ওপরের হালকা তরল পদার্থগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধল এবং একটা পুরু কঠিন আবরণ তৈরি করল, এর নাম ভূ-ত্বক্। একটা কাচপাত্রে খানিকটা মোম গালিয়ে তারপর ঠাণ্ডা হতে দাও, খানিক বাদে দেখবে ওপরে শক্ত একটা সর পড়েছে। একটা ছুরির ফলা দিয়ে আঘাত করলে বুঝবে, বাইরেটা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হলেও ভেতরটা তখনও বেশ গরম ও তরল আছে। পৃথিবীর তখন সেই অবস্থা।

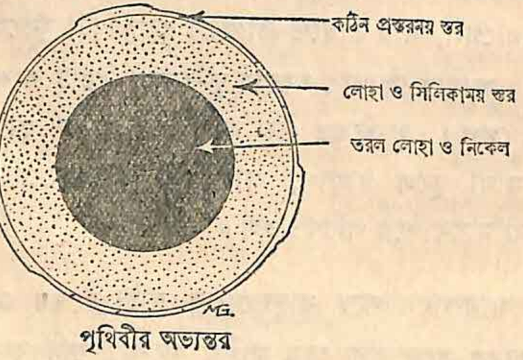
একটা কমলালেবু বেশ কয়েকদিন ঘরে রেখে দিলে দেখবে, তা ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে আর বাইরের খোসাটা কুঁচকে উঁচু-নীচু হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হলে ভেতরের পদার্থগুলোর আয়তন কমে গেল, আর তাইতে বাইরের আবরণটা কুঁচকে উঁচু-নীচু হয়ে গেল। আবার কোথাও হয়তো ভূ-ত্বকের বিরাট অংশ চাপ ধরে নীচে বসে গেল। ভূ-ত্বকের উঁচু অংশগুলো স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্বতরূপে মাথা তুলে দাঁড়াল, আর নীচু জায়গাগুলো কালক্রমে হ্রদ, সাগর বা মহাসাগরে পরিণত হল।

আরও অনেকদিন পরে বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি করল। তাই ঠাণ্ডা হয়ে জলে পরিণত হল এবং পৃথিবীর উপর বৃষ্টিধারায় নেমে এল। এইভাবে ক্রমাগত বৃষ্টির জলে স্নান করে ভূ-পৃষ্ঠ আরও ঠাণ্ড হয়ে

গেল। নীচু জায়গাগুলোতে জল জমে সাগর, মহাসাগরের সৃষ্টি করল আর উঁচু জায়গাগুলো স্থলভাগে পরিণত হল। অবশিষ্ট অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবীর চারদিকে যে আবরণ সৃষ্টি করল, তারই নাম হল বায়ুমণ্ডল।

## পৃথিবীর অভ্যন্তর

পৃথিবীর বাইরেটা ঠাণ্ডা হলেও তার ভেতরটা আজও ভয়ানক গরম। আইসল্যাণ্ডের মত বরফের দেশেও আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচণ্ড গরম লাভা বেরিয়ে আসে, তাইতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গভীর খনির মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায়, নীচের দিকে উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্র হল প্রায় চার হাজার মাইল নীচে, কিন্তু মানুষ আজও মাত্র দেড় মাইলের বেশি নীচে যেতে পারেনি। তবে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে।



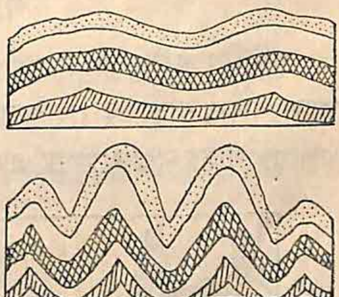

পৃথিবীর অভ্যন্তর

উপরের কঠিন ও প্রস্তরময় স্তর অর্থাৎ ভূ-ত্বক্ চল্লিশ মাইল গভীর, এর উপাদান প্রধানতঃ দু'রকম পাথর, যার নাম গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট।

এই স্তরেই ধাতু ও অধাতুর নানারকম খনিজ পাওয়া যায়, আর মানুষ তাই আহরণ করে নানা কাজে লাগায়। আঠারো শ মাইল গভীর পর্যন্ত স্তরটি লোহা ও সিলিকায় ভর্তি। এই স্তর অনেকটা পিচের মত অবস্থায় আছে, আঘাত করলে কঠিন পদার্থের মত মনে হয়, কিন্তু খুব বেশি চাপ দিলে নরম পদার্থের মত বসে যায়। এর নীচে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার মাইল প্রচণ্ড উত্তপ্ত তরল লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরি।

## ভূমিকম্প

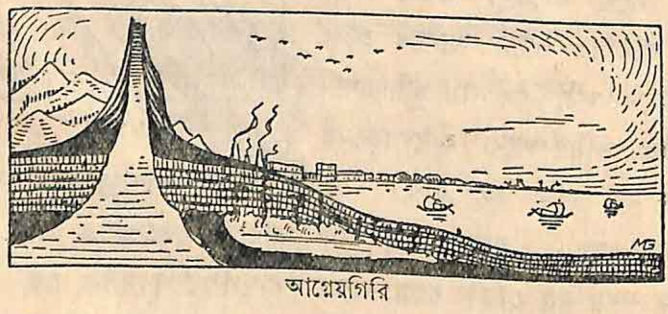
ভূ-গর্ভ যত ঠাণ্ডা হচ্ছে সেখানকার পদার্থের আয়তন তত কমে যাচ্ছে, এর ফলে সর্বদাই একটা আলোড়ন চলছে। কোথাও ভূ-পৃষ্ঠ নীচের দিকে বসে যাচ্ছে, আবার কোথাও পাথর ফেটে যাচ্ছে, আবার কোথাও হয়তো দু'দিক্‌কার পাথরের চাপে মাঝের পাথরের স্তরে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। এজন্য সময় সময় পৃথিবীর কঠিন আবরণ হঠাৎ খুব কেঁপে ওঠে, এর নাম ভূমিকম্প। সাধারণ ভূমিকম্পকে আলোড়নের একটা মৃদু অবস্থা বলা যায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ও ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের ফলে ঘরবাড়ী ভেঙেচুরে যায় বলে অনেক সময় বহু লোক মারা যায়। গাছপালা ভূমিসাৎ হয়, মাটি ফেটে যায় আর তার ভেতর থেকে গরম জল, বালি, কাদা ইত্যাদি বেরোয়।


ভূত্বকের ভাঁজ

হিমালয়, আল্পস্ প্রভৃতি পর্বত দু'পাশের অত্যধিক চাপে ভাঁজ খেয়ে উঁচু হয়ে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। বহুদিন ধরে এসব পর্বত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। এজন্য কোন পাথরের স্তর হঠাৎ হয়তো চাপ ধরে সরে যায়। এরকম বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ওপরে যেসব গাছপালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি থাকে, তা এক মুহূর্তে ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ইহাই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। বিজ্ঞানীদের মতে ১৯৩৪ সালে বিহারে, ১৯৩৫ সালে কোয়েটায় এবং ১৯৫০ সালে আসামের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প এই কারণে হয়েছিল। ভূমিপাত বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জন্য যে ভূমিকম্প হয়, তা এত প্রবল ও ব্যাপক হয় না।

## আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীর কঠিন আবরণের নীচে উষ্ণতা খুব বেশি। উত্তপ্ত ও তরল পাথর, ধাতু ইত্যাদি ওপরের পাথরের চাপে আটকা পড়ে আছে। ওপরের পাথর সব জায়গায় একরকম থাকে না। ভূ-গর্ভের চাপ হঠাৎ



আগ্নেয়গিরি

খুব বেশি হলে পাথরের কোন অংশ ফেটে সেখান দিয়ে উত্তপ্ত, গলিত পাথর, ধাতু, বাষ্প, ভস্ম, ধোঁয়া প্রভৃতি সজোরে বেরিয়ে আসে।

এরই নাম অগ্ন্যুৎপাত। গলিত পদার্থগুলোর নাম লাভা। ছিদ্রমুখে লাভা জমাট বেঁধে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠলে, তখন তাকে বলা হয় আগ্নেয়গিরি। ভূ-ত্বকের ফাটল দিয়ে ভূ-গর্ভের উত্তপ্ত ও তরল পাথরের স্তরে সমুদ্রের জল প্রবেশ করলেও হঠাৎ প্রচণ্ড চাপের উদ্ভব হয় এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হওয়া সম্ভব।

আগ্নেয়গিরি থেকে যখন সজোরে লাভা, ভস্ম ইত্যাদি বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, তখন আশেপাশের গ্রাম, নগর ইত্যাদি



আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

ধ্বংস হয়ে যায়। যে আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত হয় তাকে সজীব, বহুদিন অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ থাকার পর হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলে তাকে সুপ্ত, আর যা থেকে কখনও অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা নেই তাকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে।

বহুকাল আগেকার কথা, ইটালীর ভেসুভিয়াস নামক সজীব আগ্নেয়গিরি নিভে গেল এবং সেটা নিভে যাবার অনেকদিন পরে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে তার আশেপাশে ঘরবাড়ী তৈরি করে বাস করতে

লাগল। তারপর ৭৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ তা থেকে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত সুরু হল। দেখতে দেখতে পম্পিয়াই ও হারকিউলেনিয়াম শহর দু'টি গলিত লাভা ও ভস্মস্তূপে চাপা পড়ে গেল। একটা লোকও রক্ষা পেল না।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাভার কাছাকাছি ক্রাকাতোয়া দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয়। এখানে বিস্ফোরণের শব্দ এত জোরে হয় যে, তিন হাজার মাইল দূর থেকেও তা শোনা যায়। এক দিনের মধ্যেই সমস্ত দ্বীপটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ছত্রিশ হাজার লোক মারা যায়। সেই থেকে ক্রাকাতোয়া একটি জলমগ্ন আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে।

## খনিজ

যা খনি থেকে পাওয়া যায়, তাকেই খনিজ বলে। কিন্তু খনিজ বলতে সবই যে খনি থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে তা নয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বভাবজাত অজৈব বস্তু মাত্রই খনিজ বলে পরিচিত; যেমন—অভ্র, সৈন্ধব লবণ, মার্বেল, শ্লেট, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। এই হিসেবে মাটি এবং জলও খনিজরূপে গণ্য হয়।

**শিলার শ্রেণী-বিভাগ**—প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পুঞ্জীভূত খনিজ-পদার্থকে শিলা বলে। উৎপত্তি অনুয়ায়ী শিলাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। উত্তপ্ত ও গলিত ধাতব পদার্থ জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করেছে; গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট এই জাতের। আগ্নেয় শিলা দিয়েই প্রথম ভূ-পৃষ্ঠ তৈরি হয়েছিল।

রোদ, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদির ক্রিয়ায় আগ্নেয় শিলা ক্রমে ভেঙে-চুরে যায়। তারপর শিলার ছোট কণাগুলো নদীস্রোতের সঙ্গে ভেসে

গিয়ে সমুদ্র বা হ্রদের তলায় পলিমাটির মত জমা হয়। বহুকাল ধরে এইরকম অনেক স্তর জমা হলে, ওপরের স্তরগুলোর চাপে নীচের স্তরগুলো জমাট বেঁধে পাথরে পরিণত হয়। পলিমাটি থেকে এর সৃষ্টি বলে নাম পাললিক শিলা। বেলে-পাথর, চুনা-পাথর প্রভৃতি এইভাবে তৈরি হয়েছে। এইসব স্তর যে এককালে জলের নীচে ছিল তার প্রমাণ-স্বরূপ এতে নানারকম জীবদেহ বা কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা কঙ্কালকে জীবাশ্ম বলেন।

ভূ-গর্ভের উত্তাপে, উপরিস্থ শিলা-স্তরের চাপে ও নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনেক সময় পাথরের চেহারা বদলে যায়, এর নাম রূপান্তরিত শিলা। এভাবে গ্রানাইট থেকে নাইস, কাদা-পাথর থেকে শ্লেট, চুনা-পাথর থেকে মার্বেল প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

**খনিজের অবস্থান**—খনিজ দ্রব্য যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়, তারই নাম খনি। খনি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরেই অথবা ভূ-গর্ভে অনেক নীচে থাকতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে অনেক সময় বহু নীচের খনিজ ওপর দিকে উঠে আসে, তখন সেই খনিজ সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়।

ভারতে খনিজ সম্পদ অনুসারে বিহারই শ্রেষ্ঠ। তারপর মাদ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের নাম করা যায়। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি প্রয়োজনীয় খনিজ আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়, আর আসামে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম। লোহা, পাথর, অভ্র, ম্যাংগানিজ, মোনাজাইট প্রভৃতি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে প্রচুর বক্সাইট, যা থেকে এলুমিনিয়ম

তৈরি হয়। তামা ও সোনা কিছু আছে কিন্তু রূপা, নিকেল, সীসা, দস্তা প্রভৃতির পরিমাণ খুবই কম।

**মাটি**—ভূ-পৃষ্ঠের উপর যে নরম স্তর আছে, তাকেই সাধারণ ভাবে মাটি বলে। রোদ, বৃষ্টি, বাতাস প্রভৃতির ক্রিয়ায় পাথর ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে মাটিতে পরিণত হয়েছে। বৃষ্টির জল, নদীস্রোত বা বাতাসের সাহায্যে মাটি ক্ষয়ে যায় এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে যায়। মাটি নানারকম। বেলে মাটিতে বালি বেশি থাকে, এঁটেল মাটিতে কাদার ভাগ বেশি, আর দোআঁশ মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ সমান থাকে। লাল মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি, আর কাঁকর মাটিতে খুব বেশি কাঁকর থাকে।

**কয়লা**—গাছপালা বহুকাল ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থেকে যে পলি-পাথরের সৃষ্টি করে, তাকে কয়লা বলা হয়। কালো কুৎসিত কয়লার কত আদর তা নিশ্চয়ই জান। কয়লা ছাড়া সভ্যজগৎ একদিনও চলতে পারে না। কারণ, কয়লা ছাড়া কল-কারখানা, রেলগাড়ী, স্টীমার প্রভৃতি কিছুই চালান সম্ভব নয়। শহরে যারা আছে, একদিন কয়লা না থাকলে তাদের রাঁধা-বাড়া বন্ধ। মাটির নীচে কি করে রাশি রাশি কয়লা তৈরি হয়েছে তা কি বলতে পার? বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যখন মানুষেরও জন্ম হয়নি তখন, পৃথিবী বনজঙ্গলে ছেয়ে ছিল। আর তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোড়ন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। তাতে হয়তো জায়গায় জায়গায় এক-একটা বিরাট বন, গাছপালা, খাল-বিল সব সমেত মাটির নীচে তলিয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে এর ওপর বালি, পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা

হতে থাকে। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমে উদ্ভিদের চেহারা বদলে গিয়ে শেষ অবধি কয়লায় পরিণত হয়েছে। সেইজন্য বেলে পাথর ও কাদা পাথরের মাঝে স্তরে স্তরে কয়লা সাজান থাকে। সময় সময় কয়লার মধ্যে উদ্ভিদের জীবাশ্মও পাওয়া যায়।



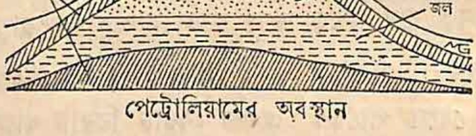

কয়লার অবস্থান

ভারতে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ছোটনাগপুর; মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমে কাদামাটি, তারপর পলি-পাথরের অনেক স্তর খুঁড়ে তবে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। কয়লা কাটতে হয় খুব সাবধানে, নতুবা উপরের ভারি স্তর ধ্বসে গিয়ে অনেক শ্রমিক মারা যেতে পারে। এজন্য বিরাট বিরাট থামের মত কয়লা রেখে বাকিটা কাটা চলে। মাটির নীচে কয়লা কাটা হলে কপিকলের সাহায্যে তা ওপরে তুলে আনা হয়, তারপর রেলগাড়ী, স্টীমার ও জাহাজের সাহায্যে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

কয়লা কি শুধু আগুন জ্বালাবার কাজেই দরকার? কয়লা থেকে আজকাল অনেক দরকারী জিনিস পাওয়া যায়। লোহার বদ্ধপাত্রে কয়লা নিয়ে তাতে উত্তাপ দিলে পাওয়া যায় কয়লা-গ্যাস, আলকাতরা, এমোনিয়া ইত্যাদি। ঐ লোহার পাত্রে যে কয়লা পড়ে থাকে, তাকেই

আমরা জ্বালানী কয়লারূপে ব্যবহার করি। কয়লা-গ্যাস দিয়ে বড় বড় শহরে আলো জ্বালান হয়। কলকাতার অনেক রাস্তায় এখনও গ্যাসের আলো দেখা যায়। এমোনিয়া থেকে পাওয়া যায় জমির সার, এমোনিয়াম সাল্‌ফেট। শুনে হয়তো অবাক্ হবে, কয়লা থেকে পাওয়া কালো চট্‌চটে দুর্গন্ধময় আলকাতরা থেকেই তৈরি হয় নানারকম রঙ, অনেক প্রকার সুগন্ধি এবং অনেক রকম ওষুধ। আর এ থেকেই পাওয়া যায় স্যাকারিন, যা চিনির চেয়েও প্রায় চার শ গুণ মিষ্টি।

**পেট্রোলিয়াম**—মাটির নীচে পলি-পাথরের স্তরে যে খনিজ তেল পাওয়া যায়, তার নাম পেট্রোলিয়াম। বিজ্ঞানীর মতে অতীতের উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ থেকেই এই তেলের সৃষ্টি হয়েছে। উপরে ও নীচে অপ্রবেশ্য পাথরের স্তর থাকলে এই তেল উৎপত্তিস্থলেই



পেট্রোলিয়ামের অবস্থান

আটকা থাকে, নতুবা সছিদ্র পাথরের ভেতর দিয়ে বা শক্ত পাথরের ফাটল দিয়ে চুইয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়। তেলের সঙ্গে জল থাকলে তেলটা জলের উপর ভেসে থাকে। এই সঙ্গে প্রচুর গ্যাস থাকাও সম্ভব। এই গ্যাসের অত্যধিক চাপে উপরের পাথর, মাটি সব সমেত ধনুকের মত বেঁকে যায় আর গ্যাস, তেল ইত্যাদি প্রবল চাপের অধীন হয়ে থাকে। এইরকম জায়গায় নলকূপ বসালে গ্যাস, তেল ইত্যাদি আপনা থেকেই সজোরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

মাটির নীচে নল বসিয়ে এই তেল তুলে আনতে হয়, তবে কাজটা খুব সহজ নয়। পানীয় জলের নলকূপ বড় জোর তিন শ ফুট গভীর হয়, কিন্তু তেলের জন্য তিন হাজার থেকে সুরু করে ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর নলকূপ বসাবার দরকার হতে পারে। ভারতে শুধু ডিগবয় অঞ্চলেই পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

মাটির নীচ থেকে তোলার পর পেট্রোলিয়াম খুবই ময়লা থাকে। একে ছেঁকে তারপর পাতন-যন্ত্রে নিয়ে উত্তাপ দিলে এ-থেকে পর পর পেট্রোল, বেন্‌জাইন, কেরোসিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। পেট্রোলের সাহায্যেই আজকাল মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতি চালান হয়। আগে উদ্ভিজ্জ তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেরোসিন তেল পাবার পর আমাদের আলো জ্বালাবার সমস্যা অনেকটা মিটেছে। পেট্রোলিয়ামের বাকি অংশগুলোও আমাদের নানা কাজে লাগে।

## প্রশ্নমালা

১। কিরূপে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল এবং শীতল হইবার পর তাহাতে কি পরিবর্তন হইল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২। শিলা ও মাটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? অগ্ন্যুৎপাতের কারণ কি? অতীতের কয়েকটি ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। ভূমিকম্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে যেসব ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মত কি?

৫। কয়লা বা পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# জল ও বায়ু

জল ও বায়ুর কথা জানতে হলে আগে বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সূত্র জানা দরকার।

## পদার্থ

আমরা এই সংসারে নানারকম জিনিস ব্যবহার করি; যেমন ধর, শিশি, বোতল, লণ্ঠনের চিমনি, মুখ দেখার আয়না ইত্যাদি। এদের এক-একটা নাম, কিন্তু এদের প্রত্যেকটি কাচ দিয়ে তৈরি। কাচ একটি পদার্থ। এইরকম জল, সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি নানারকম পদার্থের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে।

## পদার্থের নানারূপ পরিবর্তন

একটা বাটিতে খানিকটা মোম নিয়ে তাতে উত্তাপ দাও। দেখবে, কঠিন মোম গলে তরল হয়ে গেল। তেমনি, উত্তাপ দিলে কঠিন বরফ গলে প্রথমে তরল জল হয়, আরও উত্তাপ দিলে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কঠিন, তরল ও গ্যাস—পদার্থের এই তিন অবস্থা। এতে জল জলই থাকে, তার মূল ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ, ঠাণ্ডা পেলে আবার বাষ্প থেকে জল এবং জল থেকে বরফ পাওয়া যায়। একে পদার্থের **অবস্থাগত পরিবর্তন** বলে।

একটা মোমবাতি জ্বালালে খানিক বাদে সবটা মোম পুড়ে যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মোম যখন পোড়ে তখন তা থেকে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। এদের ঠাণ্ডা

করলে কিন্তু মোম ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। আর একটা উদাহরণ দিই, জলের ভেতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে তা থেকে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দু'টি গ্যাস, যাদের ধর্ম জল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

## মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ

যে পদার্থকে ভেঙে দু'টি বা বেশি পৃথক্ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়, তার নাম যৌগিক পদার্থ বা যৌগ, যেমন জল। আর যা থেকে কোন রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেই একটির বেশি পৃথক্ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া সম্ভব হয় না, তার নাম মৌলিক পদার্থ বা মৌল। হাইড্রোজেন থেকে শুধু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে শুধু অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই এসব মৌলিক পদার্থ। সোনা, রূপা ইত্যাদিও মৌলিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত প্রায় একশটি মৌলিক পদার্থের খোঁজ পেয়েছেন। এদের কোনটি কঠিন, যেমন সোনা, রূপা ইত্যাদি ; কোনটি তরল, যেমন পারা ; আবার কোনটি গ্যাস, যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি। গুণাগুণ অনুসারে আবার এদের কাউকে বলা হয় ধাতু, যেমন সোনা, রূপা ইত্যাদি ; আবার কাউকে বলা হয় অধাতু, যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক ইত্যাদি।

## মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

খানিকটা চিনি মুখে দাও, দেখবে বেশ মিষ্টি লাগছে আর সবটা চিনি মুখের মধ্যে গুলে যাচ্ছে। মনে কর, চিনির সঙ্গে খানিকটা বালি মিশে আছে, এবারে চিনি কিচ্‌কিচ্ করবে, কিন্তু তাতেও তার মিষ্টি স্বাদ বুঝতে কোন কষ্ট হবে না। তার কারণ, এতে চিনির ধর্মও

আছে, আবার বালির ধর্মও আছে। এতে খানিকটা জল দিয়ে নাড়, চিনি জলে গুলে যাবে কিন্তু বালি পড়ে থাকবে। এবারে ছেঁকে নিলেই বালি থেকে চিনি পৃথক্ হয়ে যাবে। চিনি ও বালি মিশিয়ে যা পাওয়া যায়, তা হল মিশ্রণ।

খানিকটা গন্ধক ও লোহার গুঁড়ো ভাল করে মেশাও। খালি চোখে মনে হবে তার চেহারা ও রঙ একেবারে বদলে গেল কিন্তু আতশী-কাচ দিয়ে দেখলে বুঝবে, গন্ধক ও লোহার গুঁড়ো পাশাপাশি রয়েছে। উহাতে একটা চুম্বক লাগালে দেখবে, লোহার গুঁড়ো চুম্বকের সঙ্গে লেগে যাবে কিন্তু গন্ধক পড়ে থাকবে। এতে বোঝা গেল, এই মিশ্রণে লোহার এবং গন্ধকের ধর্ম অবিকৃত রয়েছে। এই মিশ্রণটিতে উত্তাপ দিলে লোহা ও গন্ধক সম্মিলিত হয়ে ফেরাস্ সাল্‌ফাইড নামে কালো রঙের একটা নূতন জিনিস তৈরি করবে। চুম্বকের সাহায্যে এ থেকে লোহা পৃথক্ করা যাবে না, কারণ এতে লোহার ধর্ম নেই। আরও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এতে গন্ধকের ধর্মও নেই। কাজেই ফেরাস্ সাল্‌ফাইড একটি যৌগিক পদার্থ; আর যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এর সৃষ্টি হল তার নাম রাসায়নিক সংযোগ। এতে বোঝা গেল, মিশ্রণের বেলায় উপাদানগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে পাশাপাশি থাকে এবং তাদের সহজেই আলাদা করা যায়, কিন্তু উপাদানগুলো সম্মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করলে তার ধর্ম হয় সম্পূর্ণ আলাদা এবং তখন তার উপাদানগুলো সহজে আলাদা করা যায় না।

আর একটা কথা, মিশ্রণে উপাদানগুলোর পরিমাণ কতটা করে থাকবে তার কোন হিসেব নেই; কম, বেশি যা খুশি রাখতে পার। কিন্তু সেই উপাদানগুলোর রাসায়নিক সংযোগ হবার পর যে যৌগিক

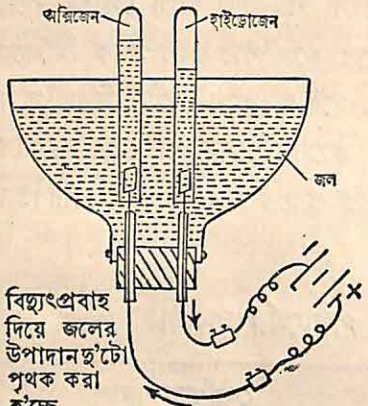
পদার্থ পাবে তাতে উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে। ওজন হিসেবে সাত ভাগ লোহার সঙ্গে চার ভাগ গন্ধক যুক্ত হয়। কাজেই আট ভাগ লোহা ও চার ভাগ গন্ধকের মিশ্রণ নিয়ে তাতে উত্তাপ দিলে ফেরাস্ সাল্ফাইড তৈরি হবার পর এক ভাগ লোহা পড়ে থাকবে। আবার সাত ভাগ লোহার সঙ্গে পাঁচ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে উত্তাপ দিলে এক ভাগ গন্ধক বেশি হবে। আর একটা বিষয় মনে রেখ, সাধারণ মিশ্রণ তৈরি করতে তাপের কোন পরিবর্তন দরকার হয় না, কিন্তু যৌগিক পদার্থ তৈরি করতে হলে তাপের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন।

## মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

| মিশ্রণ | যৌগিক পদার্থ |
|---|---|
| ১। মিশ্রণের উপাদানগুলো পাশাপাশি থাকে, মিলে এক হয়ে যায় না। | ১। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলো মিলে সম্পূর্ণ নূতন পদার্থে পরিণত হয়। |
| ২। মিশ্রণে উপাদানগুলোর নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান থাকে, কাজেই তার ধর্ম সাধারণতঃ উপাদানগুলোর ধর্মের সমষ্টিমাত্র। | ২। যৌগিক পদার্থের ধর্ম স্বতন্ত্র এবং উপাদানগুলোর ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও নূতন। |
| ৩। মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। | ৩। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক্ করা সম্ভব নয়। |
| ৪। মিশ্রণের উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। | ৪। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্দিষ্ট, তার কোনরূপ তারতম্য হতে পারে না। |
| ৫। মিশ্রণ তৈরি করতে তাপের কোন পরিবর্তন দরকার হয় না। | ৫। যৌগিক পদার্থ তৈরি করতে তাপের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। |

## জল

প্রাচীন বিজ্ঞানীরা জলকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। অনেক দিন পরে দেখা গেল, জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে তা থেকে দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন গ্যাসের ধর্ম একরকম আর অক্সিজেন গ্যাসের ধর্ম অন্যরকম এবং এদের কারও ধর্ম জলের মত নয়। কাজেই জল যৌগিক পদার্থ।



বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে জলের উপাদান দু'টো পৃথক করা হ'চ্ছে

একটা পাত্রে খানিকটা হাইড্রোজেন আর খানিকটা অক্সিজেন মিশিয়ে দিলেই কি জল তৈরি হবে? মোটেই না; প্রথমে পাওয়া যাবে একটা মিশ্রণ। এই মিশ্রণে একটা জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করালে কিংবা ব্যাটারীর সাহায্যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলে জোর আওয়াজ করে সবটা জ্বলে উঠবে এবং তাইতে গ্যাস দু'টি সম্মিলিত হয়ে জলে পরিণত হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আয়তন হিসেবে দু'ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ মাত্র অক্সিজেন যুক্ত হয়ে জল তৈরি করে। যে কোন দেশের জলেই এই পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কাজেই জল যৌগিক পদার্থ, মিশ্রণ নয়।

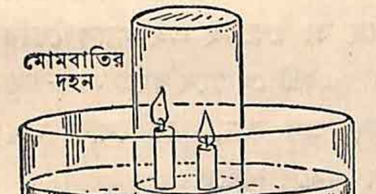
## বায়ু

প্রদীপ, মোমবাতি, কাঠ—এই সব জ্বলে। একটা প্রদীপ যত জ্বলছে, তার তেল তত কমে যাচ্ছে। এমনি করে যখন তেল একেবারে

ফুরোবে তখন প্রদীপও নিভে যাবে। প্রদীপ যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ তাপ ও আলো পাওয়া যায়।

প্রদীপ জ্বলে কেমন করে? একটা জারের মধ্যে একটা প্রদীপ জ্বেলে তার মুখটা আটকে রাখ। কিছুক্ষণ পরে বাতিটা নিভে যাবে। জারটা ঠাণ্ডা হলে দেখবে তার গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। জারের মধ্যে একটু পরিষ্কার চুনের জল দিয়ে নাড়লে তা ঘোলা হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল, বায়ুর উপাদান অক্সিজেনের সঙ্গে, তেলের উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে বলে জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাসটি চুনের জল ঘোলা করে দেয়। তেল ফুরোলে যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি বায়ুর অক্সিজেন ফুরোলেও প্রদীপ জ্বলতে পারে না।

আর একটা পরীক্ষা কর। একটা পাত্রে হু'টি মোমবাতি জ্বেলে বসিয়ে দাও। এখন পাত্রে খানিকটা জল ঢেলে তার ওপর একটা বড় কাচের জার চাপা দাও, যাতে জারের মুখটা জলের নীচে ডুবে







থাকে। একটু পরে দেখবে, বাতি হু'টি নিষ্প্রভ হয়ে তারপর নিভে যাবে এবং পাত্রের ভেতরের জল বাইরের জল-সমতল থেকে ওপরে উঠে যাবে। পাত্রের জলে একটু কস্টিক-পটাশ দিয়ে তারপর জল ঢেলে বাইরের এবং ভেতরের জল-সমতল এক করে নিলে দেখবে, জারের মধ্যে পাঁচভাগের চারভাগ গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে এবং একভাগ জলে

ভর্তি হয়ে গেছে। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কস্টিক-পটাশ দ্রবণে গুলে যায় বলে এইরকম হয়। রাসায়নিক সংযোগের ফলে যতটা অক্সিজেন কমে যায় ততটা জল জারের মধ্যে ঢোকে। এতে প্রমাণিত হল, বায়ুর পাঁচভাগের একভাগ মাত্র অক্সিজেন।

জারে যে অবশিষ্ট চারভাগ গ্যাস পড়ে রইল, তার মধ্যে প্রদীপ, মোমবাতি বা কাঠি কিছুই জ্বলে না। এই গ্যাসের প্রায় সবটাই নাইট্রোজেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দু'টি বায়ুর প্রধান উপাদান।

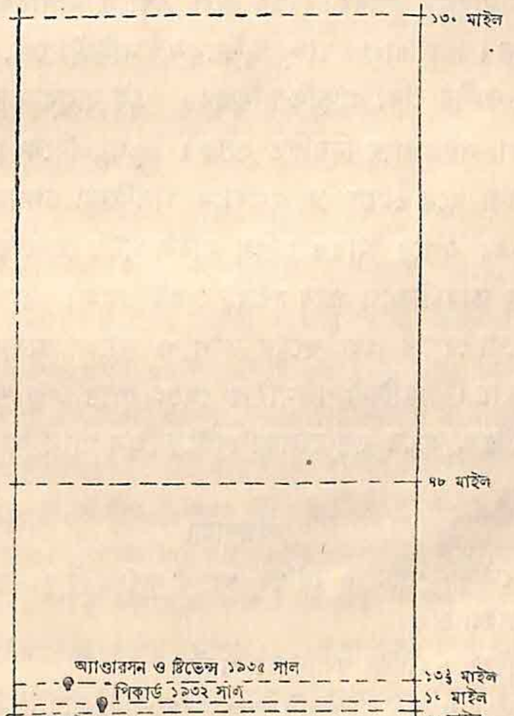
এবারে একটা কাচের ডিসে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল নিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দিলে দেখবে, তার উপর ধীরে ধীরে একটা সাদা সর পড়েছে আর চুনের জল ক্রমশ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। চুনের জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাকে ঘোলা করে দেওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের বিশেষত্ব। কাজেই প্রমাণিত হল, বাতাসে এই গ্যাসটিও আছে। জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে এবং আমাদের আশেপাশে যা কিছু জ্বলছে তা থেকেই এই গ্যাস তৈরি হয়ে অবিরত বাতাসে মিশে যাচ্ছে। একটি গেলাসে করে বরফ-জল রেখে দিলে তার গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে, এতে বোঝা যায় বাতাসের সঙ্গে খানিকটা জলীয় বাষ্পও মিশে রয়েছে।

বায়ুর উপাদানগুলো সাধারণভাবে মিশে আছে। বায়ু যে একটা মিশ্রণ, যৌগিক পদার্থ নয়, তার অনেক প্রমাণ আছে। নানারকম প্রক্রিয়ায় বায়ুর উপাদানগুলো সহজেই পৃথক্ করা যায়। যৌগিক পদার্থ হলে তার উপাদানগুলোর পরিমাণ সব সময় নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু বায়ুর বেলায় সেরকম দেখা যায় না। সাধারণ বায়ুর চেয়ে সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ের ওপরে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে।

আবার বড় বড় শহরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি উপাদানগুলো বায়ুতে যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে মিশিয়ে যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাতে তাপের কোন পরিবর্তন হয় না এবং এই কৃত্রিম বায়ুর ধর্ম সবদিক্ দিয়ে বায়ুর মতই হয়।

## বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর চারদিকে যে বায়ুর আবরণ আছে তারই নাম বায়ুমণ্ডল।




পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর আকর্ষণে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লেগে রয়েছে। পৃথিবীর ওপরে পর পর বায়ুর অনেকগুলো স্তর আছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ওপর দিকে প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। ওপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের ওপর ক্রমাগত চাপ দেয়, সেইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক ওপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত ওপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর তত পাতলা।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আট মাইল অবধি যে বায়ুস্তর আছে তাতে তাপ ও চাপের নানারকম পরিবর্তন হয় বলে এখানে নানারকম বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। সাধারণ বায়ু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির মিশ্রণ। এই বায়ুর সাহায্যে জীবের জীবনযাত্রা সহজভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ওপর দিকে বায়ুস্তর ক্রমশ এত পাতলা হয়ে গেছে যে, সেখানে শ্বাসক্রিয়া চালান কঠিন হয়ে পড়ে। এর ওপরে আরও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তা স্থির এবং তার উষ্ণতা প্রায় সর্বত্রই একই রকম। সেখানে আকাশ ঘোর কালো দেখায় এবং সূর্যের তাপ ও আলো অত্যন্ত প্রখরভাবে পাওয়া যায়। আটচল্লিশ মাইল থেকে প্রায় এক শ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত যে স্তর, তাতে শুধু হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস আছে।

## প্রশ্নমালা

১। মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থে পার্থক্য কি? জলের উদাহরণসহ বিষয়টি বুঝাইয়া দাও।

২। মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থে পার্থক্য কি?

৩। বায়ুর প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। বায়ুকে মিশ্রণ বলা হয় কেন?

৪। বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# জীব ও জীবনের ক্রিয়া

## জীবের ক্রমবিকাশ

আজ থেকে অনেক কোটি বছর আগেকার কথা, বৃষ্টির অবিরল ধারায় পৃথিবীর উপরিভাগে সাগর, মহাসাগরের সৃষ্টি হল। বায়ুমণ্ডলের কুয়াশার আবরণ ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে পৃথিবীর ওপর প্রচুর সূর্যকিরণ পড়তে লাগল। নানা জায়গায় শিলাস্তর থেকে ক্রমে নূতন মাটির সৃষ্টি হল। তারপর আরও কোটি কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে উদ্ভিদ্, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, মানুষ প্রভৃতি জীবের আবির্ভাব হল।

জীবের বৈশিষ্ট্য কি? সাধারণভাবে বলতে পারি, আমাদের আশেপাশে গাছপালা, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি যারা সচেতন তারা হল জীব; আর মাটি, পাথর, সোনা, লোহা প্রভৃতি যারা অচেতন তারা সবই জড় পদার্থ। অনেকগুলো বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়কেই জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাণীমাত্রেই যে নড়াচড়া করতে পারে তা আমরা জানি। উদ্ভিদ্ অচল হলেও তার বিভিন্ন অংশ সচল; যেমন মূল খাদ্যের সন্ধানে মাটির নীচে যায়, আবার কাণ্ড মাটি ভেদ করে ক্রমাগত ওপর দিকে উঠে আসে। জীবমাত্রেই খাদ্য দেহসাৎ করে আকারে বড় হয়। একটা ছোট চারা গাছ বড় হয়, আবার একটি শিশুও ধীরে ধীরে বাড়ে। শুধু আকারে বড় হলেই কি তাকে সজীব বলা যায়? খুব ঘন মিশ্রির দ্রবণের মধ্যে একটা ছোট মিশ্রির দানা ঝুলিয়ে দিলে দেখবে তা আকারে ক্রমশ বড় হয়।

তাহলে কি মিশ্রির দানাটা সজীব? রেলগাড়ী চলতে পারে, তাই বলে গাড়ীটা কি সজীব? মোটেই না, কারণ জীবের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। জীব বাইরের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে, উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এবং বংশ বৃদ্ধি করে। জীবের বেঁচে থাকার জন্য শ্বাসক্রিয়াও অপরিহার্য। যাতে জীবনের এইসব প্রধান লক্ষণগুলো দেখা যায় না, তাই অচেতন বা জড় পদার্থ। কাজেই জীবদেহও মৃত্যুর পর জড় পদার্থে পরিণত হয়।

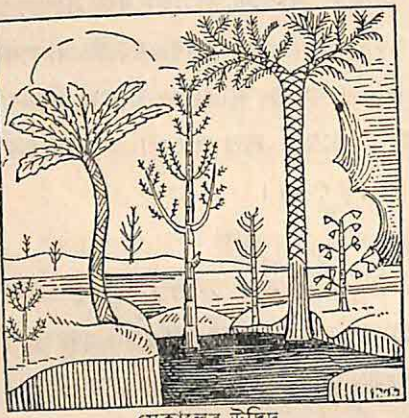
এই পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব কিভাবে এবং কখন হয়েছিল তা অবশ্য আজও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নি; তবে বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছেন, বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম জীবের জীবনযাত্রা সুরু হয়েছিল জলে। তার দেহে ছিল একটিমাত্র কোষ আর তার মধ্যে ছিল খানিকটা চট্‌চটে প্রাণপদার্থ, প্রোটোপ্লাজ্‌ম বা জীবপঙ্ক। বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছেন, কার্বন (অঙ্গার), অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও সাল্‌ফার (গন্ধক) এই কয়টি জড় পদার্থের বিচিত্র সমাবেশেই সজীব জীবপঙ্কের সৃষ্টি। কিন্তু, তাঁরা শত চেষ্টা করেও এইসব জড় পদার্থের সাহায্যে সজীব জীবপঙ্ক তৈরি করতে পারেন নি। অথচ কি অপূর্ব্ব এই সৃষ্টি! কোন্ সুদূর অতীতে হঠাৎ একদিন জড় পদার্থ থেকে প্রথম জীবের জন্ম হয়েছিল, আর তা থেকেই কত বিচিত্র উদ্ভিদ্, কত বিচিত্র প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে, তাই একবার ভেবে দেখ।

পৃথিবীর আদিম জীব একটিমাত্র কোষের সাহায্যেই খাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করত; কিন্তু এতে কোন কাজই সুনিয়ন্ত্রিত হত না। প্রত্যেক জীবেরই খাদ্য দরকার। এক জায়গায় চুপ করে

থাকলে সেখানকার খাদ্য শীগ্‌গির ফুরিয়ে যাবে, তাই এগিয়ে চলার এবং খাদ্য সংগ্রহ করার সুবিধার জন্য আদিম জীবের দেহে নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হল, আর সেজন্য জীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। এরপর একটি জীব অন্য আর একটি জীবকে আক্রমণ করে উদরসাৎ করতে শিখল, আর আক্রান্ত জীবও শিখল যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করে পালিয়ে বাঁচতে পারে। এইভাবে জীবদেহের জটিলতা ক্রমশ আরও বেড়ে গেল।

ক্রমে জীব জল ছেড়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু তারা জল ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না, তাই তাদের আস্তানা হল জলা জায়গার আশেপাশে। ডাঙায় সূর্যের তাপে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমরা যেমন রোদে যাবার সময় রঙীন চশমা পরি, তারাও তেমনি দেহে রঙের আবরণ তৈরি করল। যাদের দেহ সবুজ হল, তা থেকেই উদ্ভিদের সৃষ্টি হল। উদ্ভিদ্ মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে শিখল, ডালপালা ছড়িয়ে মাথার ওপর সুন্দর ছাতার ব্যবস্থা করল। সবুজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরি করতে সুরু করল। যারা খাদ্য তৈরি করতে পারল না, তারা উদ্ভিদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে লাগল। আর একদল জীব দেখা দিল, যারা সেইসব জীবকেই খেতে লাগল। তারা সবাই হল প্রাণী। এইভাবে জীব দু'ভাগ হয়ে গেল ; এক ভাগ হল উদ্ভিদ্, আর এক ভাগ হল প্রাণী। যেসব জীব ডাঙায় বাস করতে সুরু করল, তারাও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। কাজেই তারা দেহে জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করল, যাতে সুযোগমত আবার জলের ভাণ্ডার পূরণ করে নিতে পারে।

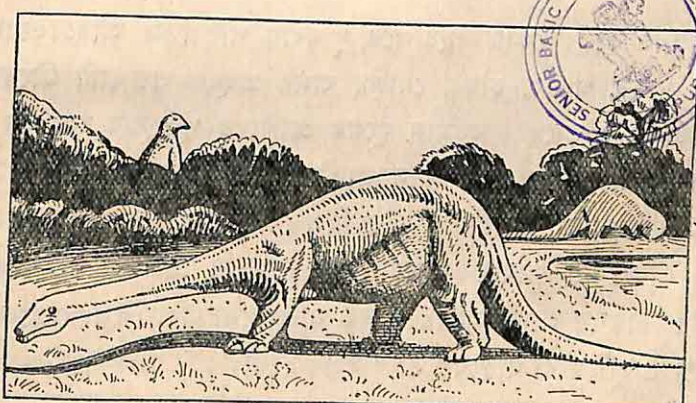
সেকালের উদ্ভিদ্ দেখতে অনেকটা পেঁপে বা কলাগাছের মত ছিল ( চিত্র দেখ ) ; কিন্তু তার না ছিল ফুল, না ছিল ফল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ্-দেহের জটিলতা বাড়তে লাগল। উদ্ভিদের বংশ-বিস্তারের জন্য ফুল ফুটল, ফুল থেকে ফল হল, আর ফলের মধ্যে বীজ দেখা দিল। এই বীজ থেকেই আবার উদ্ভিদ্-শিশুর জন্ম হল। প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্ভিদ্‌ও নানারকম ব্যবস্থা করল। কারও দেহে শক্ত পুরু ছাল হল, কারও ছাল হল তেতো, আবার কারও ছাল হল কাঁটাওয়ালা।


সেকালের উদ্ভিদ

প্রাণী খাদ্য তৈরি করতে পারল না, তাই খাদ্যের জন্য একে অন্যকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। কাজেই প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম হল আরও ভয়ঙ্কর। আত্মরক্ষার জন্যও নানারকম বিচিত্র ব্যবস্থা হল। শামুক, কচ্ছপ ইত্যাদি শক্ত খোলের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে। কোন কোন পতঙ্গ হুল ফুটিয়ে দেয় ; সাপ কামড়ে বিষ ঢেলে দেয়। গরু, মোষ ইত্যাদি শিং দিয়ে গুঁতিয়ে আত্মরক্ষা করে। হিংস্র জন্তু ধারাল দাঁত দিয়ে কামড়ে অন্য জন্তুর মাংস কেটে খেতে পারে এবং ঐভাবে শত্রুর হাত থেকে রেহাই পায়। পাখী আকাশে উড়ে সহজেই শত্রুর নাগালের বাইরে যায়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহের জটিলতা ক্রমশ বাড়তে লাগল, তবে কালক্রমে উদ্ভিদের চেয়ে প্রাণী ক্রমবিকাশের পথে অনেক বেশি এগিয়ে গেল। প্রাণীর হজমের জন্য পাকস্থলী, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফুস্‌ফুস্ হয়েছে। তাদের দেহযন্ত্র চালাবার জন্য মস্তিষ্ক ও নার্ভ তৈরি হয়েছে। চোখ, কান, নাক ইত্যাদির ব্যবস্থা হওয়ায় প্রাণী অনুভব করতে শিখেছে। আর উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর এইরূপ পরিবর্তনের ফলে এই পৃথিবীতে নানা জাতের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন হয়েছে খুব ধীরে ধীরে, বহু কোটি বছর ধরে। আজকের গাছপালা এবং জীবজন্তু দেখে অবশ্য অতীতের গাছপালা এবং জীবজন্তুর বিষয় কিছুমাত্র ধারণা করাও কঠিন।

আগেই বলেছি, সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রাণী প্রধানতঃ জলে থাকত। এরপর অতিকায় যেসব প্রাণীর আবির্ভাব হয়, তাদের কথা ভাবলেও



সেকালের প্রাণী

ভয় হয় ( চিত্র দেখ )। এরা ছিল উভচর, অর্থাৎ জলে এবং ডাঙায় ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারত। অতীতের জাইগান্টোসরাস,

ব্রোণ্টোসরাস ইত্যাদি প্রায় এক শ ফুট পর্যন্ত লম্বা হত। ভেবে দেখ, সেইসব অতিকায় তৃণভোজী প্রাণীরও স্বস্তি ছিল না, কারণ তাদের শিকার করে খেত তাদের মতই অতিকায় আর একদল হিংস্র মাংসাশী প্রাণী—টিরানোসরাস, ডাইনোসর ইত্যাদি। সেই সময় টেরোডাক্টাইল নামে বাদুড়ের মত এক অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। প্রাণীদের মধ্যে তারাই সর্বপ্রথম উড়তে পারে। আজকের পাখীর সঙ্গে অবশ্য তাদের বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এরপর যুগ যুগ ধরে ক্রমশ পৃথিবীর আবহাওয়ার কত পরিবর্তন হল, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে জীবজগতেও কত পরিবর্তন দেখা দিল! তারপর হঠাৎ এক সময় পৃথিবীর আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলো সব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

আরও কয়েক কোটি বছর পরে, পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় যেসব শূকর, গণ্ডার, হাতী, ঘোড়া, বানর প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হল, তাদেরই বর্তমান যুগের প্রাণীদের পূর্বপুরুষ বলা হয়। বিজ্ঞানীর মতে অতীতের বানরজাতীয় জীবই মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন তার শারীরিক শক্তি ছিল বেশি আর বুদ্ধি ছিল অনেক কম। কিন্তু ঐ সামান্য বুদ্ধির জোরেই মানুষ ছিল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর অনেক যুগের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের সুসভ্য ও বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া গেছে। এই হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন যে জীবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তার আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় পঞ্চান্ন

কোটি বছর আগে ; প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে প্রথম মাছের জন্ম হয় এবং প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে জন্মায় ডাঙার উদ্ভিদ্।



বানরজাতীয় মানুষ থেকে সুসভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষের ক্রমবিকাশ

প্রায় বার কোটি বছর হল পাখীর উদ্ভব হয়েছে। আর সে তুলনায় আদিম মানবের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন মাত্র, অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে।

বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি বছর আগের এইসব খবর কোথায় পেলেন, বলতে পার? যুগ যুগ ধরে বালি-কাদা জমে যেসব পলি-পাথরের স্তর সৃষ্টি করেছে সেগুলো ইতিহাসের পৃষ্ঠা, আর তার মধ্যে

যে জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ( জীবাশ্ম ) পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সাহায্যেই অতীতের জীবদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। এইসব লেখা খুঁজে বের করা যেমন কঠিন, তেমন কঠিন এই লেখার পাঠ উদ্ধার করা। কলকাতার যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবে, অতীতের অতিকায় প্রাণীদের জীবাশ্ম অনেক সাজান রয়েছে।

## উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

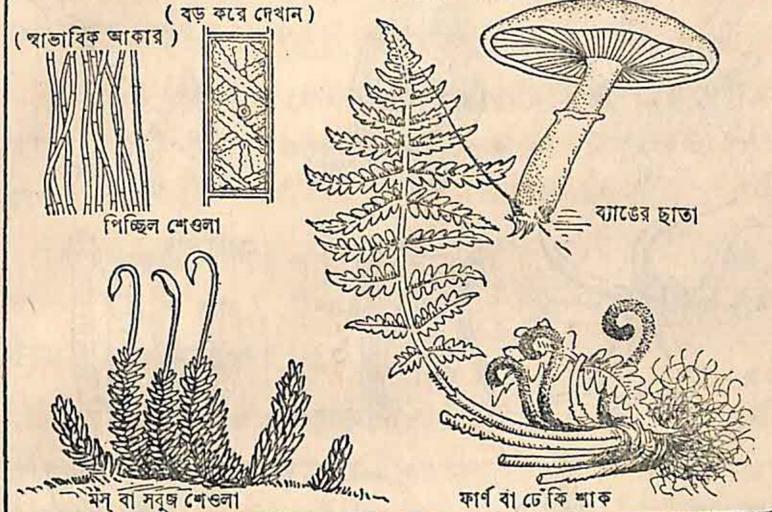
এই পৃথিবীতে আমরা যেসব উদ্ভিদ্ দেখতে পাই, তাদের কতকগুলোর ফুল ও বীজ হয় না ; এরা **অবীজ** উদ্ভিদ্। যেমন—ফার্ণ বা ঢেঁকি শাক, মস্ বা সবুজ শেওলা, পিচ্ছিল শেওলা, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি। যেসব গাছের ফুল ও বীজ হয়, তারা **সবীজ** উদ্ভিদ্। সবীজ উদ্ভিদ্ আবার দু'রকম—কতকগুলো উদ্ভিদের ফল হয় না, বীজ অনাবৃত থাকে ; যেমন—পাইন। আমরা সাধারণতঃ যেসব উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত তাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে ; যেমন—ধান, গম, নারকেল, মটর, লাউ, কুমড়ো, আম, জাম ইত্যাদি। বীজের সাহায্যেই এইসব উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়।

## প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ

প্রাণিজগৎকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :— **অমেরুদণ্ডী**, অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নেই এবং **মেরুদণ্ডী**, অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে।

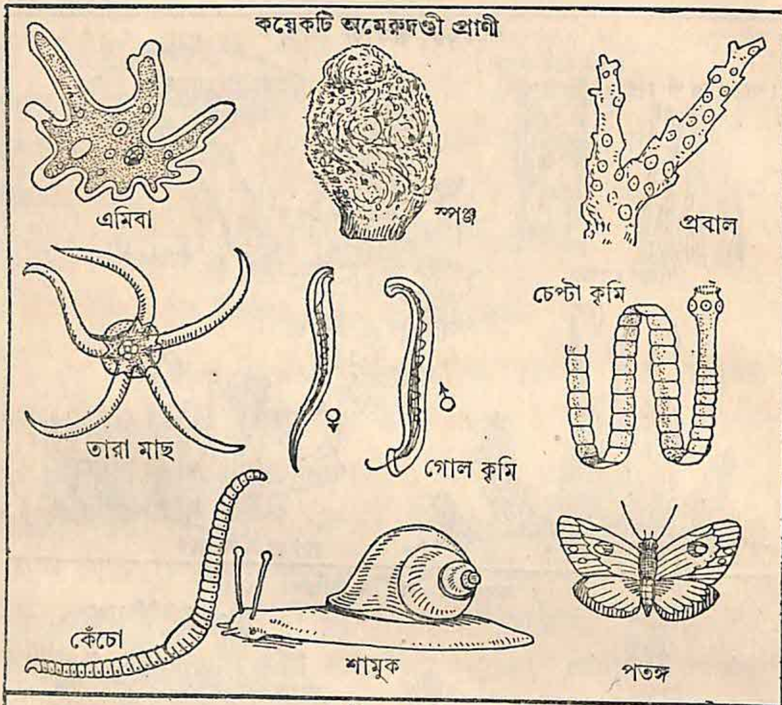
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ; যেমন— (১) আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া ( এমিবা ), (২) ছিদ্রাল প্রাণী ( স্পঞ্জ ), (৩) একনালীদেহী ( প্রবাল ), (৪) কণ্টকত্বক্ (তারা মাছ),

কয়েকটি অবীজ উদ্ভিদ




কয়েকটি সবীজ উদ্ভিদ




কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী
এমিবা
স্পঞ্জ
প্রবাল
চেপ্টা কৃমি
তারা মাছ
গোল কৃমি
কেঁচো
শামুক
পতঙ্গ


কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী
মাছ
ব্যাঙ
সাপ
গরু ও বাছুর
হাঁস

(৫) গোল কৃমি, (৬) চেপ্টা কৃমি, (৭) অঙ্গুরীমাল ( কেঁচো ), (৮) শম্বুক ( শামুক ) এবং (৯) সন্ধিপদ ( পতঙ্গ )।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বেশির ভাগই করোটি-বিশিষ্ট, তবে কারও কারও করোটি নেই। করোটি-বিশিষ্ট প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ নীচে দেওয়া হল :—

(১) অনুষ্ণ-শোণিত প্রাণীদের দেহের রক্ত ঠাণ্ডা। **মৎস্য** ( রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ ), **উভচর** ( ব্যাঙ ) ও **সরীসৃপ** ( সাপ, কুমীর ইত্যাদি ) এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) উষ্ণ-শোণিত প্রাণীদের দেহের রক্ত গরম। **পক্ষী** ( হাঁস ) ও **স্তন্যপায়ী** ( মানুষ, গরু ইত্যাদি ) এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষীদের উড়বার উপযোগী ডানা থাকে। তারা প্রথমে ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়। স্তন্যপায়ীদের বাচ্চা হয় এবং সেই বাচ্চা শৈশবে মাতার স্তন্য পান করে বেঁচে থাকে।

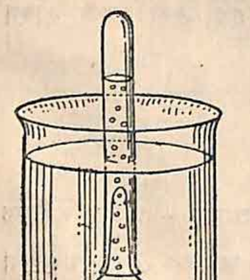
## বায়ু ও জীবজগৎ

**অক্সিজেন ও কার্বনের বিবর্তন-চক্র**—এই পৃথিবীতে কাঠ, কয়লা, তেল ইত্যাদি যখন জ্বলে, তখন তাদের উপাদানগুলো বায়ুর অক্সিজেন সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে। বায়ুর অক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারে না। জীব যখন শ্বাস নেয়, তখন তার দেহে বায়ু প্রবেশ করে। সেই বায়ুর অক্সিজেন সংস্পর্শে জীবদেহে যে মৃদু দহনক্রিয়া চলে, তাতে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র দহনক্রিয়া ও

শ্বাসক্রিয়ার ফলে প্রতিমুহূর্তে বায়ুর অক্সিজেন কমছে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। তবে কি এমন দিন আসবে যখন বায়ুর অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে যাবে? তাহলে তো কোন কিছুর দহন সম্ভব হবে না, আর সকল জীব শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে! ভয় নেই, উদ্ভিদ্ আছে বলে সে রকম হবার সম্ভাবনা নেই।

উদ্ভিদ্ পাতার সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং শিকড়ের সাহায্যে মাটির রস গ্রহণ করে। পাতার সবুজ কণার সাহায্যে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে শর্করা-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে।

পরীক্ষা: অঙ্গার-আত্তীকরণের সময় সবুজ পাতা যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং তা থেকে অক্সিজেন বার করে দেয়, তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। একটা কাচপাত্রে কিছু জল-ঝাঁঝি নিয়ে তা পুকুরের জল দিয়ে ভর্তি কর (এই জলে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে)। এখন একটা ফানেল উপুড় করে এমন ভাবে বসিয়ে দাও যাতে সম্পূর্ণ ফানেলটা জলের নীচে ডুবে থাকে। একটা পরখ-নল জলে ভর্তি করে হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তার মুখটা চেপে ধর এবং সাবধানে জলের মধ্যে উপুড় করা ফানেলটার উপর বসিয়ে দাও। কাচপাত্রটা খানিকক্ষণ রোদে রেখে দিলে দেখবে, ছোট ছোট বুদ্‌বুদ উঠে ক্রমাগত পরখ-নলে জমা হচ্ছে।



জলঝাঁঝি থেকে অক্সিজেন
বেরিয়ে পরখ-নলে জমছে
অঙ্গার আত্তীকরণের পরীক্ষা

পরখ-নলে খানিকটা গ্যাস জমা হলে আগের মত মুখ বন্ধ করে সেটা তুলে নাও। এবারে একটা শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি পরখ-নলে প্রবেশ করালে সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠবে। এতে বোঝা যায়, পরখ-নলের গ্যাস অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরের কাচপাত্রটা অন্ধকারে সরিয়ে রাখলে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন বেরোন বন্ধ হয়ে যাবে। এতে বোঝা যায় সূর্যকিরণের অভাবে অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না।

এইভাবে উদ্ভিদ্ বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে তার বদলে অক্সিজেন ফিরিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীতে যদি শুধু উদ্ভিদ্ থাকত তাহলে অল্পদিন পরেই বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ফুরিয়ে যেত এবং খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদ্ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলছে বলেই বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড এই দু'টি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে।

**জলের বিবর্তন-চক্র**—জল ছাড়াও উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না, কারণ জীবদেহের প্রধান উপাদানই হল জল। আর এজন্য জলের আর এক নাম জীবন। এই পৃথিবীর জলের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হবার নয়। সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই বৃষ্টির জলধারা ভূ-পৃষ্ঠের গা বয়ে প্রথমে নদীতে এবং পরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। এ ছাড়া খাল-বিল, নদ-নদী প্রভৃতির জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুর সঙ্গে মেশে, এতে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে সাময়িকভাবে জল একেবারে শুকিয়ে যায় সত্যি, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়েই মেঘের সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টির আকারে আবার ভূ-পৃষ্ঠে

ফিরে আসে। যুগ যুগ ধরে বায়ুমণ্ডলে এইভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে বলেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এত সহজ হয়েছে।

বায়ু যেন আমাদের দীনবন্ধু-দাদার ভাণ্ডার। এ থেকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যখন যা দরকার তাই পেয়ে বেঁচে থাকছে, কিন্তু এ ভাণ্ডার কখনও ফুরোবার নয়। এ থেকে যতই খরচ হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে তা আবার পূরণ হয়ে থাকছে। আর তাইতে পুরাতনের পুষ্টি ও নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।

## প্রশ্নমালা

১। জীব কাহাকে বলে? জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য কি?

২। আদিম জীব প্রোটোজোয়া হইতে কত রকম উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩। অক্সিজেন ও কার্বনের বিবর্তন-চক্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। বায়ুর সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক কি, বুঝাইয়া দাও।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# আকাশ পর্যবেক্ষণ

### সৌরজগৎ

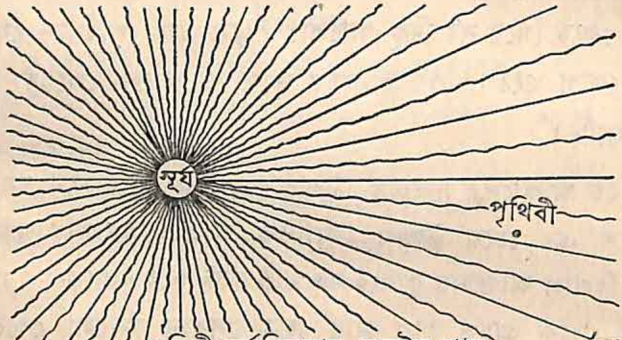
সূর্য—সূর্যোদয়ের অপূর্ব শোভা নিশ্চয়ই দেখেছ। ভোরের বেলা পূব আকাশে সূর্য যখন একটা সোনার থালার মত দেখা দেয়, তখন আঁধার কেটে গিয়ে সব দিক্ আলোয় ছেয়ে যায়, পৃথিবীও যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। সূর্যের প্রচুর তাপ ও আলো পেয়েই আমরা বেঁচে আছি।

সূর্যই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয়, কিন্তু আকাশে এর চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আরও আছে। সূর্য যেন একটা বিশাল আগুনের কুণ্ডের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। যুগ যুগ ধরে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ আর চোখ-ঝল্‌সান আলো বেরোচ্ছে। এর কোন বিরাম নেই। একটা জ্বলন্ত উনানের পাশে দাঁড়ালে বুঝবে বেশ তাপ লাগছে। একটু দূরে সরে যাও, তাপ বুঝতে পারবে না। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটি পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে তাই রক্ষে, খুব কাছে থাকলে এই পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে যেত।

সূর্যের এই অপরিসীম দূরত্ব কি আন্দাজ করতে পেরেছ? মনে কর, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দশ ঘণ্টা তুমি ক্রমাগত হেঁটে চললে, হয়তো পনর মাইল পথ যাবে। যদি রেলগাড়ীতে চেপে এই দশ ঘণ্টা চল, তাহলে হয়তো তিন শ মাইল যেতে পার। আজকাল এরোপ্লেন খুবই দ্রুতগামী, ঘণ্টায় তিন শ মাইল বেগে চলতে পারে। কাজেই

এরোপ্লেনে চেপে এই দশ ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল যাওয়া সম্ভব। যদি একটা এরোপ্লেনে চেপে কোথাও না থেমে ক্রমাগত সূর্যের দিকে যেতে পারতে তাহলে সূর্যে পৌঁছাতে কতদিন সময় লাগত বলতে পার? লাগত প্রায় ৩৫ বছর ৫ মাস।

গ্রীষ্মকালের দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছট্‌ফট কর, একবার রোদে দাঁড়িয়ে আন্দাজ কর কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাচ্ছ, তখন সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ঙ্কর



পৃথিবী সূর্যকিরণের কতটুকু পায়

একবার ভেবে দেখ। জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২৩ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ঙ্কর তার হিসেব বিজ্ঞানী করেছেন—সমস্ত পৃথিবীর উপর একসঙ্গে যে তাপ এসে পৌঁছায় তা যদি এক জায়গায় জমা হত, তাহলে দশ লক্ষ মণ জল এক মিনিটের মধ্যেই টগ্‌বগ করে ফুটে উঠত। পূর্ণিমার রাতে চাঁদ থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সূর্যের আলো তার প্রায় ছ' লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

তোমরা জান, পৃথিবী সব জিনিসকে আকর্ষণ করে। সূর্যও তেমনি সব জিনিসকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অনেক গুণ বড় আর ভারি বলে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক বেশি। কাজেই পৃথিবীর এক মণ ওজনের জিনিস সূর্যে ২৭ মণ ভারি বোধ হবে। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর প্রায় তের লক্ষ গুণ। যেখানে পৃথিবীর পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল, সেখানে সূর্যের পরিধি প্রায় সাতাশ লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার মাইল। মনে কর, একটা রেলগাড়ীতে চেপে সমস্ত পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসতে লাগল প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ দিন, তাহলে সেইভাবে সূর্যের উপর দিয়ে ঘুরে আসতে লাগবে প্রায় দশ বছর চার মাস। এইবার ভেবে দেখ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য কত বড়!

দূরবীণ দিয়ে দেখলে দূরের জিনিস কাছে এবং বড় দেখায়। রঙীন কাচে ঢাকা দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের উজ্জ্বল গায়ে অনেক কালো কালো গহ্বরের মত দেখা যায়; ওগুলো সৌরকলঙ্ক। এই গহ্বরগুলোর কোনটি এত বড় যে আমাদের পৃথিবীও অনায়াসে তার মধ্যে তলিয়ে যাবে। এসব গহ্বরের চারপাশ থেকে যেন ভয়ঙ্কর আগুনের শিখা হাজার হাজার মাইল ওপরে উঠে আসছে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত সূর্যের ওপরে সব সময় যে কি ভয়ঙ্কর তোলপাড় হচ্ছে তা ধারণা করাও কঠিন।

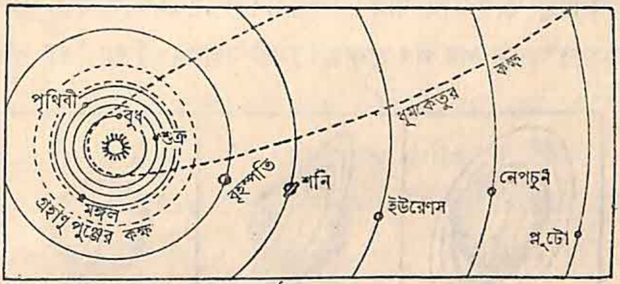
**গ্রহ ও উপগ্রহ**—দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে চারদিক্ আঁধার হয়ে আসে, আর অন্ধকারে কালো আকাশের গায়ে যেন হাজার হাজার দীপ জ্বলে ওঠে। ওগুলোর মধ্যে ৮টি গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ বাদে বাকি সবগুলোই নক্ষত্র। নক্ষত্রদের নিজের আলো আছে। এজন্য

বিজ্ঞানীরা সূর্যকেও একটি নক্ষত্র বলেন। নক্ষত্রদের থেকে গ্রহদের চেনবার উপায় কি? গ্রহগুলো স্থিরভাবে উজ্জ্বল আলো দেয়, মিটমিট করে না। এদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো এদের গায়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। সেই ছড়ান আলোর কিছু অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আঁধার ঘরে একটা আয়না রাখ, কিছুই দেখতে পাবে না; কারণ এ থেকে কোন আলো বেরোয় না। একটা প্রদীপ জ্বাল, দেখবে, এ থেকে আলো বেরোচ্ছে। সামনে আয়নাটা রাখ, প্রদীপের আলো তার গায়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আয়নাটা দেখা যাচ্ছে। সূর্যও একটা বিশাল প্রদীপের মত জ্বলছে আর গ্রহগুলো তারই আলো যেন আয়নার মত ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাই আমরা গ্রহদের উজ্জ্বল রূপ দেখতে পাই।

এই পৃথিবীটাও একটা গ্রহ। একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, পৃথিবীও তেমনি ক্রমাগত ঘুরছে। একবার ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, তা হতে আমরা রাত আর দিন বুঝতে পারি। পৃথিবী কি শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পাক খাচ্ছে? মোটেই না, এইভাবে পাক খেতে খেতে সে আবার নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তাইতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতু প্রকাশ পাচ্ছে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে লাগে তিন শ পঁয়ষট্টি দিন বা এক বছর। এক বছর পরে তাই ঋতুগুলো আবার পর পর ফিরে আসে। অন্যান্য গ্রহগুলোও পৃথিবীর মত পাক খাচ্ছে এবং সূর্যের চারদিকে নিজ নিজ কক্ষ-পথে ঘুরছে।

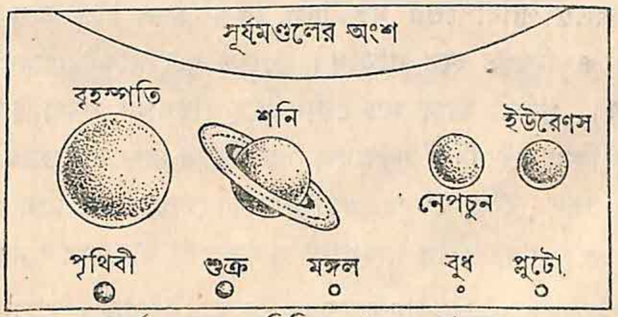
সূর্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে তার নাম হল বুধ, তারপর শুক্র এবং তারপর পৃথিবী। অন্যান্য গ্রহগুলোর কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের

বাইরে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে একদিকে আছে শুক্র এবং আর একদিকে মঙ্গল। কাজেই খালি চোখেও এই গ্রহ দু'টি সহজেই চেনা




সৌরজগৎ

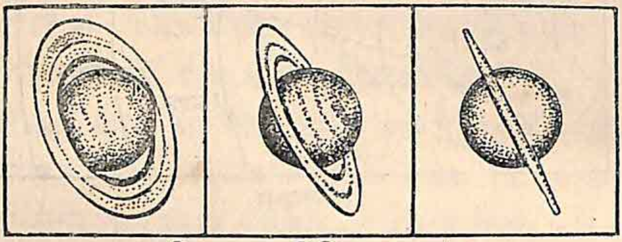
যায়। শুক্র কিছুদিন পূব আকাশে 'শুকতারা' রূপে এবং কিছুদিন পশ্চিম আকাশে 'সাঁজের তারা' রূপে দেখা দেয়। মঙ্গল আপন কক্ষ-পথে ঘুরতে ঘুরতে দু'বছর পরে একবার পৃথিবীর খুব কাছে আসে। তখন একে বেশ লালচে ও জ্বলজ্বলে দেখায়।




সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন

মঙ্গলের পরে আছে গ্রহাণুপুঞ্জ, অর্থাৎ ছোট ছোট প্রায় দু'হাজার গ্রহকণিকার সমষ্টি। এরপর আছে বৃহস্পতি, গ্রহদের মধ্যে যার

আয়তন এবং ওজন সবচেয়ে বেশি। সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন খুবই কম (পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দেখ)। বৃহস্পতির পরে যে গ্রহটি আছে, তার নাম শনি। দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয় শনিকে বেষ্টন করে আছে পর পর সুন্দর তিনটি বলয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই



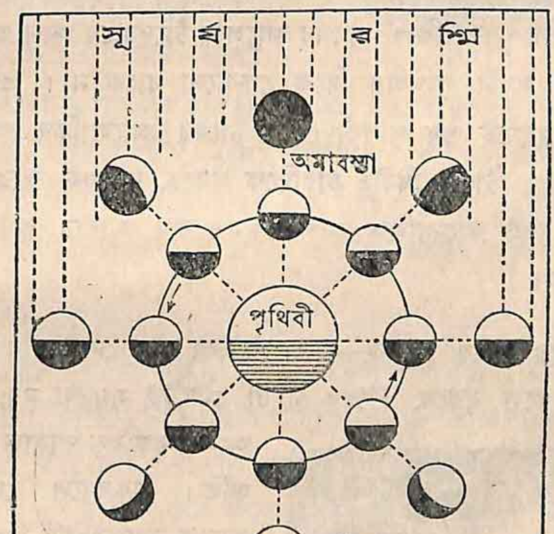
শনিবলয়ের বিভিন্ন অবস্থান

বলয় সরু বা মোটা দেখায়। শনির পরে আছে **ইউরেনস, নেপচুন** ও **প্লুটো**।

পৃথিবী যেমন নিষ্প্রভ, অন্যান্য গ্রহগুলোও সেরকম। সুদূর অতীতে এরা জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডের মত ছিল, কিন্তু ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এরকম কঠিন ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলোকেই এদের উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে গাছপালা, জনপ্রাণী ইত্যাদি আছে কিনা এই নিয়ে এককালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলত ; কিন্তু যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় অন্য কোন গ্রহে পৃথিবীর মত গাছপালা বা জনপ্রাণী থাকা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘুরছে। চাঁদ তার **উপগ্রহ**। কোন গ্রহের একটি, আর কোন গ্রহের অনেকগুলো উপগ্রহ আছে—যেমন মঙ্গলের দু'টি, বৃহস্পতির এগারটি, শনির ন'টি, ইউরেনসের চারটি এবং নেপচুনের মাত্র একটি উপগ্রহ আছে। অন্যান্য গ্রহদের কোন উপগ্রহ নেই।

**চন্দ্র**—পূর্ণিমার রাতে পূব আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, তখন তার সুন্দর রূপ দেখে কার না ভাল লাগে। এমন কি ছোট্ট খোকাটিও হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ধরতে চায়। কিন্তু চাঁদকে ধরা কি এতই সোজা ? চাঁদ আছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে। অবশ্য সূর্যের তুলনায় চাঁদ রয়েছে যেন আমাদের ঘরের কাছে। যে এরোপ্লেন চড়ে সূর্যে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ বছর, তাতে করে চাঁদে পৌঁছাতে লাগবে মাত্র তেত্রিশ দিন চার ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।




অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথি

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। তাহলে আমরা জ্যোৎস্নার আলো পাই কোথা থেকে ? সূর্য একটা বিশাল প্রদীপের মত জ্বলছে

বলে তা থেকে জোরালো আলো বেরোচ্ছে। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে লেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তার যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছে, তাকেই আমরা চাঁদের জ্যোৎস্না বলি।

আর একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। পূর্ণিমার চাঁদ গোলাকার, কিন্তু তারপর রোজই চাঁদ কিছুটা করে ছোট হতে হতে কাস্তের মত সরু হয়ে যায় এবং অমাবস্যার রাতে তাকে একেবারেই দেখা যায় না। আবার যত দিন যায় তত বড় হতে থাকে এবং প্রায় এক মাস পরে আর এক পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদকে গোলাকার দেখা যায়। এর কারণ কি? সূর্যের আলোয় চাঁদের যে অংশ আলোকিত হয় তার সবটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে না। প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ সবটা দেখা যায়। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কাজেই তার অবস্থান অনুসারে এই আলোকিত অংশ কখনও কম আবার কখনও বেশি দেখা যায়।

চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়। দূরবীণ দিয়ে দেখলে বুঝবে, চাঁদের গা'টা মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু, অনেক বড় বড় পাহাড় আর গর্তে ভর্তি। এককালে যে এখানে অনেক আগ্নেয়গিরি ছিল তা বেশ বোঝা যায়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যেসব গলিত ধাতব পদার্থ ওপর দিকে ছিটকে উঠেছিল, তা আজও জমাট বেঁধে রয়েছে। তাই চাঁদের এমন চেহারা! পাহাড়-পর্বতের



চাঁদের পাহাড় পর্বত

মাঝে যেসব বড় বড় গর্ত আছে তাতে সূর্যের আলো যেতে পারে না বলে ঐ রকম কালো দেখায়। এরই নাম 'চাঁদের কলঙ্ক'।



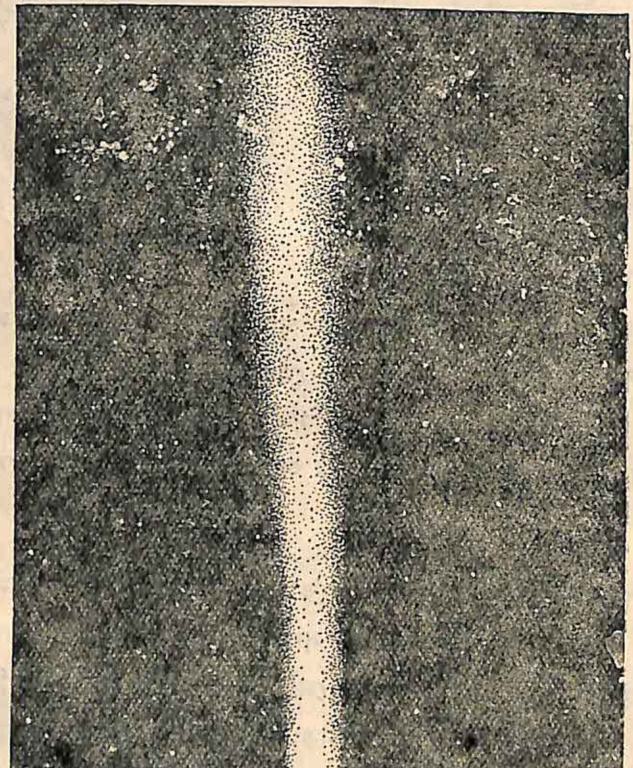
চাঁদের কলঙ্ক

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এ তো সবাই জানে। আর একটা মজার কথা শোন, চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বরাবর চাঁদের একটা দিক্ই দেখতে পাই, এর কারণ কি? বিজ্ঞানী হিসেব করে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও একবার পাক খায়। তাই চাঁদের একটা দিক্ই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাঁদের আর এক পিঠে কি আছে তা আজও আমরা দেখতে পাই নি।

যদি কোন রকমে চাঁদে গিয়ে হাজির হতে পার, তাহলে কি দেখবে জান? দেখবে, চাঁদ একটা পাহাড়-পর্বতে-ভরা ঠাণ্ডা মরুভূমির মত—তাতে জল নেই, বাতাস নেই, গাছপালা, জনপ্রাণী কিছুই নেই। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ অনেক ছোট। চাঁদের ওজন কম বলে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক কম। কাজেই পৃথিবীতে যা খুব ভারি তাও চাঁদে খুব হালকা মনে হবে।

উল্কা—আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেক সময় দেখা যায়, হঠাৎ একটা তারা যেন খসে পড়ল। আসলে এরা জ্বলন্ত

জড়পিণ্ড, তারা নয়। এগুলো মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়, পৃথিবীর আকর্ষণে হঠাৎ হয়তো খুব জোরে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র জ্বলে ওঠে। এদের নাম উল্কা।



হ্যালির ধূমকেতু

অনেকের ধারণা, ধূমকেতু ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে উল্কার সৃষ্টি করেছে।

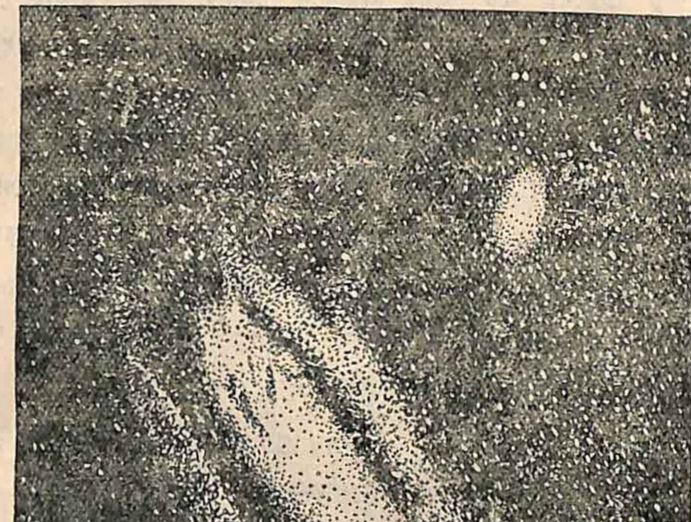
**ধূমকেতু**—গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়া আর এক রকম জ্যোতিষ্ক মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যায়, এদের নাম ধূমকেতু। অনেকগুলো ধূমকেতু গ্রহদের মত সূর্যের চারদিকে ঘোরে, কিন্তু ঘোরার সেই পথগুলো সব এত দীর্ঘ যে বহুদিন পর পর এদের দেখা সম্ভব হয়। প্রথম আবির্ভাবের সময় ধূমকেতু একটি উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডের মত দেখায়। সূর্যের আরও কাছে এলে তার উজ্জ্বল ঝাঁটার মত পুচ্ছটি পরিষ্কার দেখা যায়। এ পর্যন্ত যতগুলো ধূমকেতুর কথা জানা গেছে তার মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সূর্যের কাছে ফিরে আসতে এর মোটামুটি পঁচাত্তর বছর সময় লাগে। ১৯১০ সালের ৭ই মে তারিখে একে দেখা গিয়েছিল, কাজেই তোমরা যদি ১৯৮৫ সাল অবধি বেঁচে থাক তাহলে একে দেখতে পাবে।

সূর্য এবং সূর্যের চারদিকে যেসব গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কা ঘুরছে তাদের নিয়েই এই বিশাল সৌরজগৎ গঠিত।

## নক্ষত্রজগৎ

**নক্ষত্র**—গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়া নীল আকাশে আরও যেসব দীপ জ্বলছে বলে মনে হয়, সেগুলো সবই নক্ষত্র। সূর্যের মত এরাও জ্বলছে, তাই এদের নিজেদের আলোই আমরা দেখতে পাই। নক্ষত্রের আলো ম্লান, সর্বদাই যেন মিটমিট করছে। নক্ষত্রের কোনটি আকারে সূর্যের মত বা তার চেয়ে ছোট, আবার কোনটি সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বড় এবং তেজোময়। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে বলে এদের এত ছোট দেখায়। রাতের বেলা মেঘ না থাকলে খালি চোখেই প্রায় তিন হাজার নক্ষত্র একসঙ্গে দেখা যায়। কাজেই খালি চোখে মোট প্রায় ছ' হাজার নক্ষত্র দেখা সম্ভব।

দূরবীণের সাহায্যে এ পর্যন্ত এত বেশি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যে তার হিসেব করাও কঠিন।



নীহারিকা

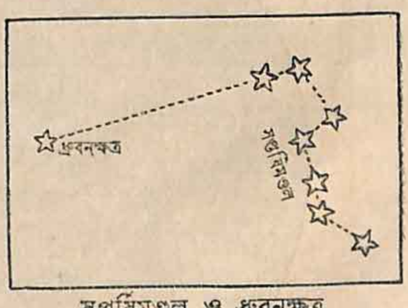
নীহারিকা—দূরবীণ দিয়ে দেখলে নীহারিকার পাতলা মেঘের

মত রূপ আমাদের চোখে পড়ে। এর আকার দেখে মনে হয়, বহুদূরবিস্তৃত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি যেন একটা চাকার মত ঘুরছে। অনেকে মনে করেন, এইরকম কুণ্ডলী-পাকানো নীহারিকা থেকেই হয়তো নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

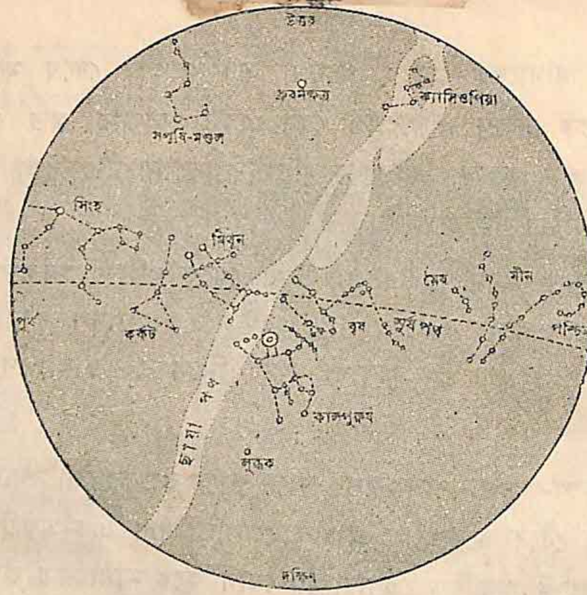
**ছায়াপথ**—আঁধার রাতে উত্তর থেকে দক্ষিণে আকাশ জুড়ে একটা উজ্জ্বল পথের মত দেখা যায়, এরই নাম ছায়াপথ। দূরবীণ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে অসংখ্য নক্ষত্র মিলে এই ছায়াপথের সৃষ্টি করেছে।

**নক্ষত্রমণ্ডল**—আকাশের স্থানে স্থানে কতকগুলো নক্ষত্র মিলে যেন দল বেঁধে রয়েছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌রা এক-একটি দলের নক্ষত্রগুলোকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে নানারকম জীবজন্তুর আকার কল্পনা করতেন। নক্ষত্রের এইরকম দলকে নক্ষত্রমণ্ডল বলা হয়।

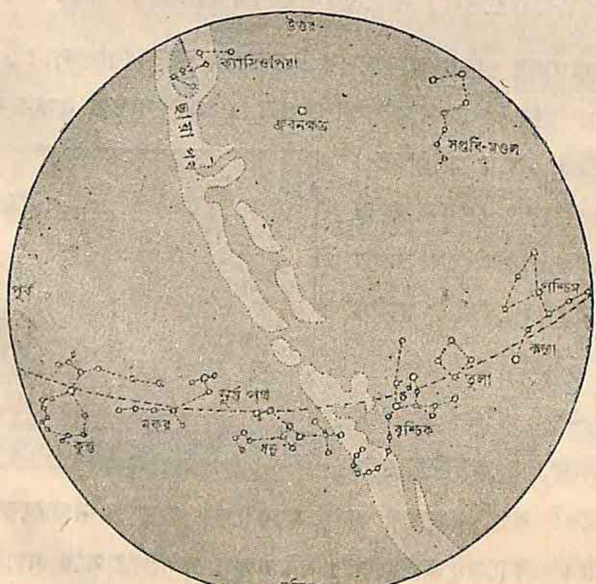
গ্রীষ্মকালের রাতে আকাশের উত্তরদিকে কাছাকাছি সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় ; এর নাম **সপ্তর্ষিমণ্ডল**। এই সাতটি নক্ষত্র সাতজন আর্য ঋষির নামে পরিচিত। এই মণ্ডলের শেষ দু'টি নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে সেই রেখাটি আরও বাড়িয়ে দিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির ওপর দিয়ে যায়, তার নাম **ধ্রুবনক্ষত্র**। এই নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এবং আকাশের অন্যান্য নক্ষত্রকে ঘুরতে দেখা যায়। কাজেই আকাশের সব নক্ষত্র ক্রমাগত সরে যাচ্ছে বলে




সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবনক্ষত্র




( পৌষ-মাঘ )




( আষাঢ়-শ্রাবণ )

মনে হলেও ধ্রুবনক্ষত্র উত্তরদিকে বরাবর একই জায়গায় দেখা যায়। রাতের আঁধারে দিক্ ভুল হলে ধ্রুবনক্ষত্র দেখে আমরা দিক্ ঠিক করতে পারি। ইউরোপের জ্যোতির্বিদ্‌রা এই নক্ষত্রমণ্ডলকে একটা ভল্লুকের আকার কল্পনা করে তার নাম দিয়েছেন 'Great Bear' বা 'বৃহৎ ভল্লুক'।

ধ্রুবনক্ষত্রের একদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল; তার উল্‌টো দিকে উত্তর আকাশেই ছায়াপথের মধ্যে আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার নাম ক্যাসিওপিয়া। কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একে ইংরেজী 'W' অথবা 'M'-এর মত মনে হয়।

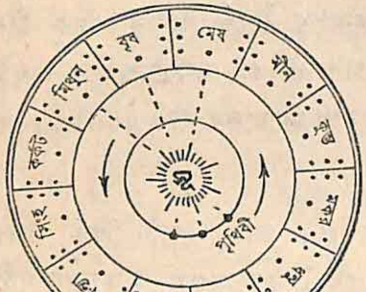
পৌষ-মাঘ মাসে সন্ধ্যার পর পূব আকাশে একটা নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়, এর নাম কালপুরুষ। একটা মানুষ যেন মাথার ওপর একটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে আছে ধনুক, কোমরে আছে কোমরবন্ধ, আর তা থেকে ঝুলছে ছোট্ট একটা তলোয়ার। কালপুরুষের ডান পায়ের একটু দূরেই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখা যায়, এর নাম লুব্ধক।



কালপুরুষ ও লুব্ধক

**রাশিচক্র**—পৃথিবী যতই আপন কক্ষ-পথে এগিয়ে যায়, ততই পূব আকাশে নূতন নূতন নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়, আর পশ্চিম আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে যায়। বারো মাসে পৃথিবী একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে, এই সময়ের মধ্যে

একে একে বারোটি প্রধান নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্‌রা এদের যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের আকার বলে কল্পনা করেছেন। এদের প্রত্যেকটি এক-একটি রাশি, আর বারোটি রাশি নিয়ে যে আকাশ-বলয় তৈরি হয়েছে, তার নাম রাশিচক্র।




রাশিচক্র

**নক্ষত্রের দূরত্ব**—নক্ষত্রদের মধ্যে সূর্যই আমাদের সবচেয়ে কাছে, কিন্তু তার দূরত্বও পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। এর পরই যে নক্ষত্রটি আছে, তার নাম প্রক্সিমা সেণ্টরাই। এর দূরত্ব কত জান? পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। অন্যান্য নক্ষত্র রয়েছে কোটি কোটি মাইল দূরে। দূরত্বের এই হিসেব দেখলে মাথা ঘুরে যায়। বিজ্ঞানীরা তাই নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার জন্য একটা সুন্দর মাপনী ঠিক করেছেন। এই মাপনী কি রকম তাই বুঝিয়ে বলছি।

তোমার এই বইটা কতটুকু লম্বা? তুমি একটা স্কেল দিয়ে মেপে বলবে, সাত ইঞ্চি। তোমাদের ঘরটা কতখানি লম্বা? এবারে স্কেল দিয়ে মাপা বড় মুশকিল, তাই ফুটের মাপ দরকার। ফিতে দিয়ে মেপে বলবে, ঘরটা পঁচিশ ফুট লম্বা। মনে কর, দূরত্ব আরও অনেক বেশি হল, কলকাতা থেকে দিল্লী কতদূর তাই মেপে বলতে হবে। এবারে মাইলে হিসেব করবে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে গিয়ে আমরা মাইলের হিসেবেও দিশেহারা হয়ে যাই।

প্রক্সিমা সেণ্টরাই নক্ষত্রের দূরত্ব অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করলে কেমন দাঁড়ায় দেখ—

২৫,০০,০০০,০০,০০,০০০ মাইল।

আলো সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে যায়। অন্ধকারে একটা দীপ জ্বালালে, মাত্র এক সেকেণ্ড সময়ে আলো ছুটে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে। এখন যদি বলি, একটা জিনিস এক 'আলো-সেকেণ্ড' দূরে আছে, তাহলে বুঝবে সেই জিনিসটা আসলে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে আছে। কত সহজে দূরত্বটা বোঝানো গেল!

চাঁদ পৃথিবী থেকে দু' লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগে প্রায় দেড় সেকেণ্ড। কাজেই এখন আমরা বলব, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব দেড় 'আলো-সেকেণ্ড'। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। সূর্যের অলো পৃথিবীতে আসতে লাগে ৪৮০ সেকেণ্ড বা আট মিনিট, কাজেই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আট 'আলো-মিনিট'। এই হিসেবে প্রক্সিমা সেণ্টরাই নক্ষত্রের দূরত্ব সাড়ে চার আলো-বছর। এই দূরত্বের কথা একবার ভেবে দেখ! এই নক্ষত্রটি থেকে আজকে যে আলো বেরিয়েছে তা পৃথিবীতে পৌঁছাবে সাড়ে চার বছর পরে, যদিও এই আলো ছুটে চলেছে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে।

আর একটা মজার কথা শোন, যে আলো আজ দেখলাম তাতে বুঝলাম, সাড়ে চার বছর আগে নক্ষত্রটি ওখানে ছিল। আজ যদি নক্ষত্রটি হঠাৎ নিভে যায়, তবে তা আমরা বুঝতে পারব সাড়ে চার বছর পরে। আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র দেখা গেছে যাদের আলো পৃথিবীতে আসতে কোটি বছর কেটে যায়।

## ব্রহ্মাণ্ড

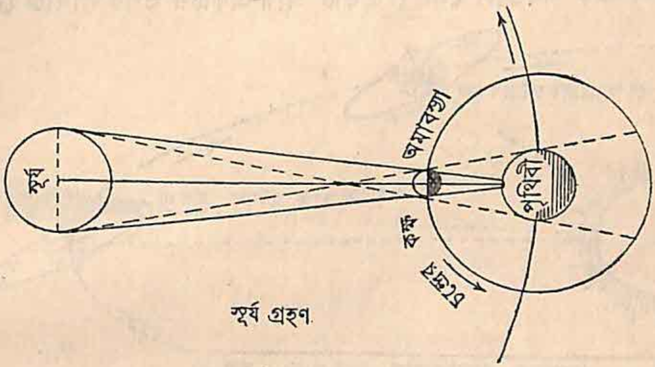
সৌরজগৎ নক্ষত্রজগতের একটি অতি নগণ্য অংশ, আর এদের সব মিলিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। একবার ভেবে দেখ এই ব্রহ্মাণ্ডটা কি বিশাল! তার তুলনায় আমাদের পৃথিবী যেন মহাসমুদ্রের মাঝে একবিন্দু জলের মতই তুচ্ছ। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সবই মহাশূন্যে অবিরাম গতিতে প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে। কোথায় তা কে জানে!

## সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বেশ মজার একটা গল্প প্রচলিত আছে। রাহু নামে একটা দৈত্য আছে। সেটা বিরাট একটা হাঁ করে সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলে, তাই হঠাৎ চারদিক্ আঁধার হয়ে যায়। কিন্তু দৈত্যটার গলা কাটা, সেজন্য গ্রাস করলেও সূর্য বা চন্দ্র আবার গ্রাসমুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে। এ তো গেল পুরাণের গল্প। জ্যোতির্বিদ্‌রা অনুসন্ধান করে বুঝতে পেরেছেন, পৃথিবী ও চন্দ্রের আলো-ছায়ার খেলাতেই এইরকম গ্রহণ দেখা যায়।

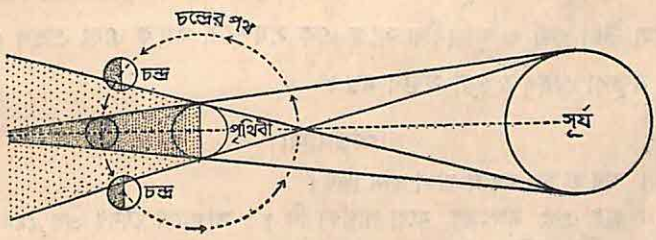
একটা প্রদীপ জ্বাল—আলো সোজাসুজি চোখে এসে পড়ছে। এবারে একটা টিনের চাক্‌তি চোখের সামনে রাখ, চাক্‌তিটার ছায়া এসে চোখের ওপর পড়বে, কাজেই প্রদীপটা আর দেখা যাবে না। আগেই বলেছি, সূর্য একটা সুবিশাল দীপের মত জ্বলছে, আর পৃথিবী ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ-পথে ঘুরছে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অমাবস্যার দিনে হয়তো সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চন্দ্র এসে পড়ল, তাহলে কিছু-ক্ষণের জন্য পৃথিবী থেকে সূর্যকে দেখা যাবে না; এরই নাম সূর্যগ্রহণ। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই ঘুরছে, তাই কিছুক্ষণ পরেই আবার সূর্যকে

দেখা যাবে। আবার পূর্ণিমার রাতে হয়তো সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী এসে পড়ল। তখন কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর ছায়া পড়ল




সূর্য গ্রহণ

চন্দ্রের ওপর; এরই নাম **চন্দ্রগ্রহণ**। অল্পক্ষণ পরেই এই ছায়া সরে যাবে এবং ছায়ামুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ আবার দেখা যাবে।

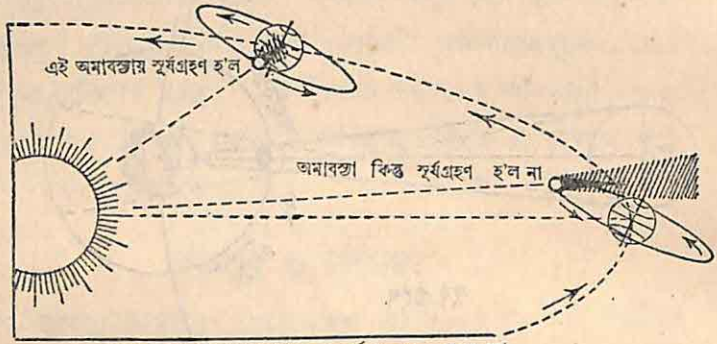



চন্দ্রগ্রহণ

সূর্য বা চন্দ্র সবটা ঢাকা পড়লে তাকে বলে **পূর্ণগ্রাস** এবং আংশিকভাবে ঢাকা পড়লে তাকে বলে **খণ্ডগ্রাস**। সূর্যগ্রহণের বেলায় কদাচিৎ **বলয়গ্রাসও** দেখা যায়; চন্দ্রগ্রহণের বেলায় কিন্তু সেরকম হওয়া সম্ভব নয়। বলয়গ্রাসে সূর্যের মাঝখানটা ঢাকা পড়ে, কিন্তু চারদিকে আলোকিত অংশ বলয়ের মত দেখা যায়।

প্রত্যেক অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন, বলতে পার?

প্রত্যেক অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র ঠিক সমসূত্রে থাকে না বলেই এরকম হয়। এর কারণ, পৃথিবীর কক্ষতল ও চন্দ্রের কক্ষতল এক সমতলে নেই ; একটি আর-একটির ওপর সামান্য হেলে




প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না

আছে এবং পরস্পর দু'টি বিন্দুতে ছেদ করেছে। চন্দ্র যদি ঘুরতে ঘুরতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে একটি ছেদ-বিন্দুতে এসে পড়ে তাহলে উহা সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে এক সমসূত্রে থাকে এবং গ্রহণ দেখা যায়, নতুবা গ্রহণ হওয়া সম্ভব নয়।

## প্রশ্নমালা

১। সূর্য বা চন্দ্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? আকাশে যেসব গ্রহ দেখা যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। নিম্নলিখিত জ্যোতিষ্কগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :
(ক) শনি, (খ) ধূমকেতু, (গ) উল্কা এবং (ঘ) নীহারিকা।

৪। নক্ষত্রমণ্ডল কাহাকে বলে? কয়েকটি প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ধ্রুবতারা কাহাকে বলে? আকাশে ধ্রুবতারার অবস্থান কিরূপে নির্ণয় করিবে, চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৬। সূর্যগ্রহণ কিরূপে হয়, বুঝাইয়া বল। প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না কেন?